জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ • সংখ্যা-২৪ • বর্ষ-৬

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ • সংখ্যা-২৪ • বর্ষ-৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ : **স্বর্ণা আক্তার**

অলঙ্করণ : **আদনান অভি**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণে টেকসই উন্নয়নের পথে

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ যে দেশটির জন্ম তার বয়স এখন ৫০ বছর। এ দেশটির যিনি স্থপতি, যিনি জাতির পিতা, সেই কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষও এ বছরটিতেই উদযাপিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ বছরটি একটি আলোকিত ও গৌরবময় বছর।

বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৫ মার্চ রাতে যেভাবে ঢাকায় ঘুমন্ত মানুষের উপর ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তা একমাত্র হিটলার মুসোলিনীর নারকীয়তার সাথেই তুলনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘ ২৪ বছর এ দেশের মানুষকে শোষণ নির্যাতনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছিল– দেশকে পর্যবেশিত করেছিল শ্মশানে। তাদের এই শোষণের বিরুদ্ধে শুরু হয় স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন।

বাংলাদেশের মানুষকে অধিকার বঞ্চিত রাখার হীন উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠী বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। গর্জে ওঠে ছাত্র জনতা। ৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারি রক্ত বিসর্জন দিয়ে রুখে দেয় তাদের ষড়যন্ত্র। রোপিত হয় স্বাধীনতার বীজ। সেই রক্ত ধারাতেই স্রোতস্মান হয়ে ওঠে স্বাধীনতা যুদ্ধ। জন্ম নেয় বাংলাদেশ। সেই স্বাধীনতারই গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ এর ২৬ মার্চ। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যে সীমাহীন আনন্দ উপচে পড়ছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা হয়তো কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি কিন্তু তাই বলে যা অর্জিত হয়েছে তাও কম নয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের হার ছিল ৭৫% এর উপরে, এখন তা নেমে এসেছে ২২% এর নিচে; শিক্ষার হার ছিল ২০%, এখন তা ৭৮% এর উপরে। গড় আয়ু ছিল ৪২ বছর, এখন তা ৭৪ বছর; সে সময় মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১২৯ ডলার, এখন তা ২০৬৪ ডলারেরও বেশি; ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২০ সালে রপ্তানি আয় ৩৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানির পরিমাণ ৪৯ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে জিডিপির আকার ছিল ৭৫৭৫ কোটি টাকা, এখন এর পরিমাণ ৩৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৩ বিলিয়ন ডলার, রেমিটেন্স ২০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ২০২০ সালে ছিল ২.৩৩৭ বিলিয়ন ডলার। চীনের পরে বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। গার্মেন্ট রপ্তানি দেশের উৎপাদন জিডিপির প্রায় ৪৫ শতাংশ এবং মোট জিডিপির ৭ শতাংশ। সাড়ে ৪ হাজারের বেশি পোশাক কারখানায় ৪০ লাখের বেশি মানুষ কাজ করছে যার ৮০ শতাংশই নারী। এছাড়াও দেশে ছোট বড় হাজার হাজার শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। ১৯৭৩ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫৩, যা ২০১৮ সালে ২২ জনে নেমে এসেছে। ১৯৯৯ সালেও মাতৃ মৃত্যুর হার ছিল ৪.৭৮ শতাংশ, এখন তা ১.৬৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের এই উন্নয়নে বিশ্ব অবাক হয়েছে। জন্মলগ্নের বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে অর্ধশতকে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তাকে অভিভূত হওয়ার মতো ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তার ভাষায়– বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতির দেশ।

বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও ভারত সরকারের সাবেক প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৌশিক বসুর মতে, এ দেশের সাফল্যের বড় অংশের পেছনে ফজলে হাসান আবেদের ব্র্যাক এবং মুহম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের মতো এনজিওগুলোর অবদান রয়েছে। বর্তমানে আশা, বুরো বাংলাদেশসহ অসংখ্য এনজিও/এমএফআই প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং এর মাধ্যমে ৩ কোটিরও অধিক দরিদ্র মানুষ আজ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে। এনজিওরা দরিদ্র মানুষগুলোকে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে। এর ফলে ক্ষুদ্রঋণ টেকসই উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের মূল্যায়ন হচ্ছে, এভাবে উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যে এই দেশটি হবে ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। একই সাথে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে।

স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে একটি স্বনির্ভর উন্নত দারিদ্র্যমুক্ত এক মানবিক বাংলাদেশে পরিণত হবে– যে বাংলাদেশের প্রত্যাশাতেই লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে, অসংখ্য নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে। সেই সুদিনের আশায় সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

৫০ বছরের বাংলাদেশ
ক্রমাগত স্বনির্ভরতার দিকে

ফেরদৌস সালাম

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৪। বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দান করেন, তা ছিল তাঁর জীবনের শেষ বিজয় দিবসের ভাষণ। মূলত: তাঁর জীবনে তিনি তিনটি বিজয় দিবস পেয়েছিলেন। ৭২, ৭৩ এবং ৭৪ এর বিজয় দিবস। ৭৪ এর বিজয় দিবস এর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কিনা সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনি আপনার কর্তব্য দেশের জনগণের প্রতি কতোটা পালন করেছেন সেটাই বড় কথা।

তিনি তার ভাষণে আরো উল্লেখ করেছেন– বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা, বলেছেন যমুনা নদীর উপর ব্রিজ করতে হবে, কিভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে হবে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়াতে হবে, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করতে হবে– তাহলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু অর্থনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন রাজনীতিবিদ, ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তক। মৃত্তিকার সাথে ঘণিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত একজন রাজনীতিবিদ যে অর্থনৈতিকভাবে বোদ্ধা ব্যক্তিত্ব হবেন এটাই স্বাভাবিক। সে কারণেই তিনি তার ভাষণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল বিষয়গুলো নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি খুব বেশি সময় দেশ পরিচালনার সুযোগ পাননি এবং যে সময়টুকুই তিনি পেয়েছিলেন তা ছিল একজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খুবই কম সময়। শুধু তাই নয়, সে সময়টিতে একদিকে তাঁকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করতে হয়েছে, অন্যদিকে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক আন্দোলন মোকাবেলা করতে হয়েছে। তদুপরি তার ভাষণে এটি স্পষ্ট যে, তাঁর সরকার এবং দলীয় লোকজনদের মধ্যেকার স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ফলে দেশের উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এতো এতো বাঁধা-বিপত্তির মধ্যেও বঙ্গবন্ধু দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছিলেন। তিনি যে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ৭৫ এর ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে বঙ্গবন্ধুর সেই উন্নয়ন পদযাত্রা বাঁধাগ্রস্ত হয়।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকাকালীন যে তিনটি বাজেট পেশ করা হয় তা হচ্ছে ১৯৭২-৭৩ সালে ৭৮৬ কোটি টাকা, ১৯৭৩-৭৫ সালে ৯৯৫ কোটি টাকা এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে ১০৮৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫০১ কোটি, ৫২৫ কোটি এবং ৭৪-৭৫ সালেও ৫২৫ কোটি টাকা। এই স্বল্প বাজেট নিয়েই বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু উন্নয়ন উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডের পর দেশে দীর্ঘকাল আওয়ামী-বিরোধী বিভিন্ন দল ও জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ক্ষমতার এই পালা বদলে সরকারের কিছু মূলনীতিতেও পরিবর্তন ঘটে– বিশেষ করে শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ বেসরকারিকরণ নীতি চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশটির জন্ম মুহূর্তে ১৯৭২-৭৩ সালে মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার যে বাজেট দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে ২০২০-২১ অর্থবছরে সেই বাজেটের আকার হয়েছে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিগত ৫০ বছরে নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অনেক অনেক দূর এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এটা ঠিক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় যদি সোনার মানুষদের ক্ষমতা ও প্রভাবের আধিক্য থাকতো তবে এ দেশ এতোদিনে মালয়েশিয়া- তাইওয়ানকেও পেছনে

ফেলে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা ঘটেনি কিছু মানুষের দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ও নৈতিকতাহীনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে। এদেশে রাজনৈতিক শুদ্ধাচারের খুব বেশি অভাব। ক্ষমতায় যাবার জন্য এ দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদই দেশের চেয়ে দল এবং দলের চেয়েও ব্যক্তি স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেন। কিন্তু তারাই আবার এই দর্শন তুলে ধরেন যে, ব্যক্তির চেয়ে দল এবং দলের চেয়ে দেশ বড়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে লাখ লাখ জীবনহানি হয়েছে। হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়েছে। লাখ লাখ বাড়িঘর সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে। এদেশের ১ কোটিরও অধিক মানুষকে দেশ ত্যাগ করে ভারতের শরণার্থী শিবিরে মারাত্মক দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও যারা ছিলেন তাদেরকেও প্রতিনিয়ত মৃত্যু আতঙ্ক এবং প্রায়শই হানাদারদের নির্যাতনের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই মুক্তিযুদ্ধের পর সেসব দেশের মানুষের চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তাদের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা, কর্মপ্রিয়তা, অন্যের প্রতি সহনশীলতা ও সহমর্মিতাসহ অনেক মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এখানে সাধারণ জনগণ নৈতিকভাবে ভালো থাকলেও রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মসংশ্লিষ্ট মানুষের অধিকাংশই নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। যে কারণে, বঙ্গবন্ধু যে উন্নয়নধারা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রকাশ সেভাবে ঘটেনি। যথাযথ উন্নয়ন লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রতিটি ভাষণেই দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করতেন।

উপরোক্ত বিষয়টির অবতারণা এই কারণে যে, বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ হলেও উল্লেখিত কারণে ৫০ বছরে উন্নয়নের যে স্তরে পৌঁছানোর কথা তা সম্ভব হয়নি। তারপরও এটি বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা যে, বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে অভাবনীয় উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। এর পেছনে এটি একটি বড় কারণ যে, অতীতের সহিংস রাজনীতির অবসান ঘটেছে। এখন আর হরতাল-অবরোধ এবং জ্বালাও-পোড়াও এর রাজনৈতিক আবহ নেই বললেই চলে। সেই সাথে সরকারের দীর্ঘস্থায়িত্ব থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকতা লাভ করেছে। ফলে এখানে উন্নয়ন গতিশীলতা পেয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ২৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপির আকার ছিল ৭ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা, মাথাপিছু আয় মাত্র ১২৯ ডলার। দারিদ্রের হার ছিল ৭০ শতাংশের উপরে। পঞ্চাশ বছর পর সেই হিসাবগুলো আকাশ পাতাল ব্যবধান। ২০২০ সালের হিসাবে রপ্তানি আয় ৩৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপি ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ২৭ লাখ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় ২০৬৪ ডলারেরও বেশি। দারিদ্রের হার কমে হয়েছে ২০.৫ শতাংশ। ১৯৭৫ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করে বলেছিলেন– 'বটমলেস বাস্কেট'। আজ সেই আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নয়নে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে বাংলাদেশকে অনুসরণের পরামর্শ দেয়। বলা হয়েছে, এভাবে উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যে এই দেশটি হবে ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হতে ৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ৩টি শর্তই পূরণ করে। পরে ২০২১ সালেও ৩টি শর্ত পূরণের প্রয়োজনীয় দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘের নিয়মানুযায়ী কোনো দেশ পরপর দুটি দ্বিবার্ষিক পর্যালোচনায় উত্তরণের মানদন্ড পূরণে সক্ষম হলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পায়। বাংলাদেশ সেই সুপারিশ লাভ করেছে। জাতিসংঘের সেই ৩টি শর্ত হচ্ছে– মাথাপিছু আয়, অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলা এবং সবশেষে মানব সম্পদ উন্নয়ন। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে ১২৩০ ডলার, বাংলাদেশে ২০২০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২০৬৪ ডলার। অর্থনৈতিক ঝুঁকি কতোটা আছে, তা নিরূপণে ১০০ স্কোরের মধ্যে ৩২ এর নিচে স্কোর হতে হয়। বাংলাদেশ সেখানে রয়েছে ২৫.২ স্কোর। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজন ৬৬% এর উপরে স্কোর, বাংলাদেশ পেয়েছে ৭৩.২ স্কোর।

গত কয়েক দশকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে, রেমিটেন্স বেড়েছে, কৃষি শিল্পের উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বেড়েছে, অবকাঠামো উন্নয়নও হয়েছে। মূলত প্রান্তিক পর্যায়ে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও-এমএফআই এর সুবিস্তৃত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখন অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে যেখানে গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের পরিধেয় জামাকাপড়ের মধ্যে পুরুষদের ২/৩টি লুঙ্গি এবং নারীদের ক্ষেত্রে ২টি শাড়ি জোটানোও ছিল কঠিন– সেখানে এখন একটি হত দরিদ্র পরিবারের পুরুষ ও নারীর বছরে ৭/৮টি লুঙ্গি এবং শাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি পরিধানের জন্যে আনুসাঙ্গিক শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবী, জুতো ও নারীদেরও অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্র লক্ষণীয়। এটি সম্ভব হয়েছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে। অর্থাৎ এ দেশের মানুষের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে ক্রয় ক্ষমতাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতীতে কৃষি খাত দেশের অর্থনীতিতে অধিক ভূমিকা রাখতো। ৮০'র দশক থেকে রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান দুটো ক্ষেত্রেই শিল্পখাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এক সময় ঢাকা এবং ঢাকা সংলগ্ন টঙ্গী ছাড়া খুব বেশি শিল্পায়ন চোখে পড়তো না– আর এখন শুধু মহাসড়কের ধারেই নয় গ্রামের রাস্তার ধারে লাখ লাখ ছোট বড় শিল্প কারখানা। পোশাক খাত এবং এনজিওদের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার সিংহভাগই হচ্ছে নারীদের দ্বারা। তাদের ক্ষমতায়ন এবং জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এভাবে শিল্প খাতের উন্নয়নে দেশের প্রসাধনী শিল্প বিশেষ করে নারীদের ব্যবহৃত প্রসাধনী শিল্পেরও বিকাশ লাভ হয়েছে। দেশে এনজিও খাতের ক্ষুদ্রঋণ ও লাখ লাখ ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় যারা ৫/১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে যাত্রা করেছিল তাদের এক বড় অংশ এখন ৫/১০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগী-গরু পালনের মাধ্যমে শুধু নিজেরাই নয়, অন্যের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এভাবেই বাংলাদেশ উন্নয়নের রুটে এখন দ্রুতগামী অশ্বে পরিণত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সূচকেই শুধু নয়, বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে মানব সম্পদ সূচকেও প্রভূত উন্নতি করেছে। দেশে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষণীয়। ১৯৭৩ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫৩ যা ২০১৮ সালে এসে প্রতি হাজারে ২২ জনে নেমে এসেছে। ১৯৮১ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ২১২ জন। ২০১৮ সালের পরিসংখ্যানে সেই হার হাজারে ২৯। ১৯৯১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ৪.৭৮ শতাংশ এখন তা ১.৬৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অপুষ্টি এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি সেখানে স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের ৫০ বছর নানা দিক থেকেই আলোকিত, আলোচিত, প্রশংসিত। এক সময় যে বাংলাদেশ একটি সুই প্রস্তুত করতেও ছিল অসামর্থ, সেই বাংলাদেশে এখন রপ্তানিমুখী সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণ হচ্ছে। ওষুধ শিল্পে বাংলাদেশের উন্নয়ন এতোটাই উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডাসহ ইউরোপের দেশ সমূহেও বাংলাদেশের ওষুধ বাজারজাত হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ১৯৭২ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি। খাদ্য উৎপাদন হতো ১ কোটি ১০ লাখ টন। ২০১৯-২০ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪ কোটি টন। জাতিসংঘের তথ্য মতে, বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান এবং মাছ উৎপাদনে ৪র্থ, আলুতে ৭ম এবং আম উৎপাদনে শীর্ষে। ইলিশ মাছেও বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। সবই সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের ফলে।

পাকিস্তানের সাময়িকী সাউথ এশিয়ার মার্চ সংখ্যায় 'ফাস্ট ট্র্যাক' শিরোনামের প্রবন্ধে বলা হয়েছে–২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলো পাঁচ দশকে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা অভাবনীয়। দেশটির জিডিপি এখন ৩৩০ বিলিয়ন ডলার, ২০০৪ সাল থেকে এর বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি ৫ শতাংশ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, রেমিট্যান্স ২০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ২০২০ সালে ছিল ২ দশমিক ৩৩৭ বিলিয়ন ডলার, একই সঙ্গে রপ্তানি ও আমদানি ছিল যথাক্রমে ৩৩ বিলিয়ন এবং ৪৯ বিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাক খাত অত্যন্ত শ্রম-নিবিড় এবং দেশটির শিল্পায়নের দিকে মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। চীনের পরে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। গার্মেন্ট রপ্তানি তার উৎপাদন জিডিপির প্রায় ৪৫ শতাংশ এবং মোট জিডিপির ৭ শতাংশ। সাড়ে ৪ হাজারের বেশি পোশাক কারখানায় ৪০ লাখের বেশি মানুষ কাজ করছে, যার ৮০ শতাংশই নারী। এটি বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে ৮৪ শতাংশ অবদান রাখে। এইভাবে এ খাত বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রবণতা এবং অর্থনীতির পরিবর্তনের পথকে উন্মুক্ত করে। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ ক্রমাগত স্বনির্ভর সোনার বাংলায় পরিণত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশ নির্ভরতা কাটাতে সক্ষম হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রজেক্ট পদ্মা সেতু বিদেশি আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই তৈরি করে বাংলাদেশ দেখিয়ে দিয়েছে 'আমরা পারি'। আর এর পেছনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা অনেক। সার্বিক মূল্যায়নে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, বাংলাদেশ আগামী দশ/পনের বছরের মধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয় এবং যতারীতি উন্নত দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২-এর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন, আমরা শ্মশান হওয়া বাংলাকে স্বনির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করবো– যেখানে মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি দেশ গঠনে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তার সেই স্বপ্ন আজ পূরণের পথে।

তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই কথাটিও স্মরণযোগ্য যে, চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কিনা সন্দেহ। সকলকে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্ম প্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থাকতে হবে। এদেশের মানুষের বিশেষ করে রাজনীতিবিদ, আমলা এবং ক্ষমতার বলয়ে সংযুক্ত ব্যক্তিদের চরিত্রের পরিবর্তন খুবই জরুরি। এটি হলে বাংলাদেশ খুব দ্রুতই একটি উন্নত মানবিক দেশে পরিণত হবে যা হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা।■

● লেখক : সম্পাদক, প্রত্যয়

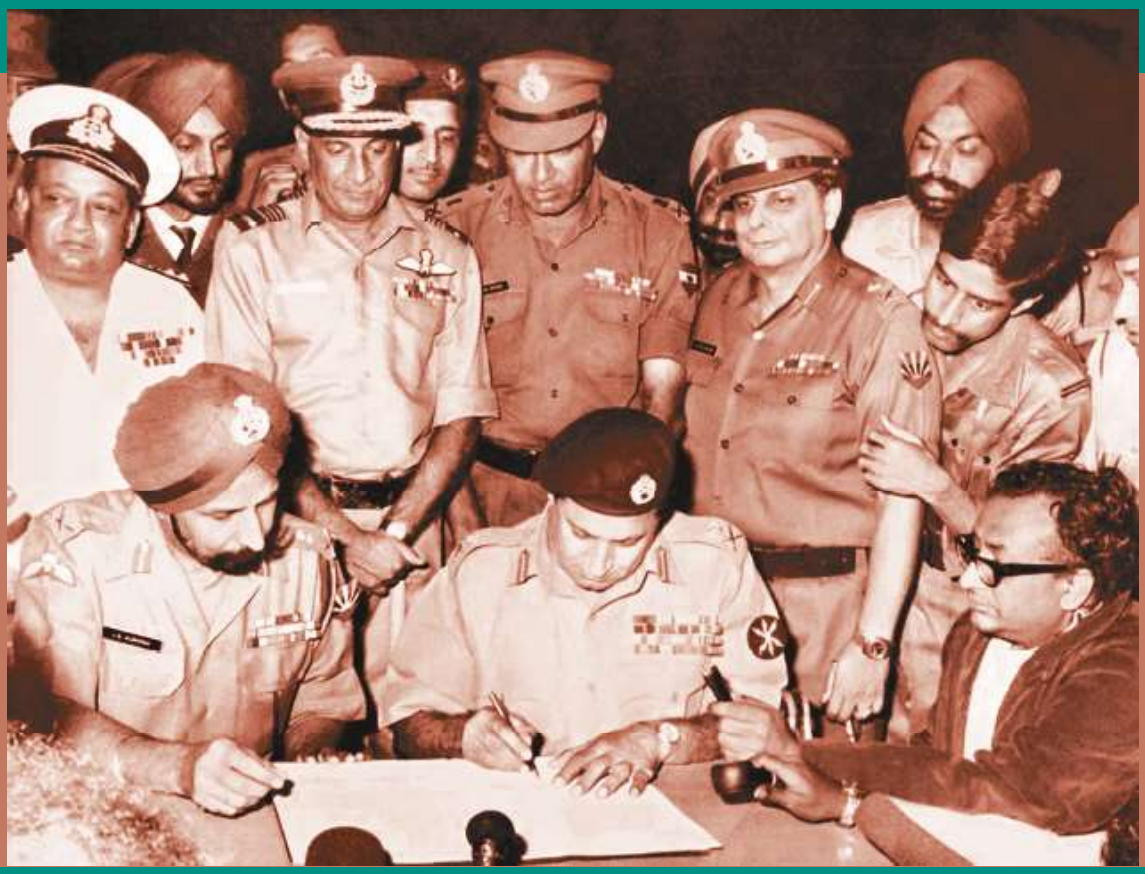

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ হিন্দু ও মুসলিম এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামক দুটি দূরবর্তী অংশে বিভক্ত। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ১২০০ মাইল, মাঝখানে ভারত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষা বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ছিল পশতু, সিন্ধি, বেলুচি ও পাঞ্জাবি। পাকিস্তানের শাসনভার ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের মোহাজের নেতৃবৃন্দের হাতে। এই শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা ধরনের নিপীড়ন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ঘোষণা দেয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের কারো মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। এটা ছিল ভারত প্রত্যাগত মোহাজেরদের ভাষা। এছাড়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মোহাজের নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এর প্রতিবাদে পাকিস্তানের পূর্বাংশে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভাষার প্রশ্নে ও অন্যান্য বঞ্চনা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবির মিছিলে শাসক গোষ্ঠীর পুলিশ গুলি চালালে সালাম, জব্বার, বরকত, রফিকসহ কয়েকজন শহীদ হন। ফুঁসে ওঠে এই জনপদের মানুষ। এ সময় পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে আন্দোলন করেন। এর মধ্যে ৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলেও পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে। এসব প্রশ্নে এ অঞ্চলে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। এই পটভূমিতে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান ঘটে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক আমলাতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের পরিবর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল সমাবেশে বলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এরপর সারাদেশ আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার নির্দেশে ঢাকাসহ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান মিলিটারি নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। তারা অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও মানুষের ক্ষতিসাধন করে। সে রাতেই বঙ্গবন্ধু ইপিআর-এর ওয়ারলেসের ডিকোডেড মেসেজের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানি কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও বাঙালি সেনারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেরিত নির্দেশকে ভিত্তি করে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে আওয়ামী লীগের আবদুল হান্নান, কালুরঘাটে স্থাপিত বেতার কেন্দ্রের বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ এবং ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এমএজি ওসমানী এমএনএ-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে (তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার পরিবর্তিত নাম) ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ শেষে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৭১-এর মে মাসে কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয় এবং ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এমএনএ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৭১-এর ৭-১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১-এর ১০ আগস্ট সামরিক শাসক ইয়াহিয়া কর্তৃক বিশেষ সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনমূলক বিচারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১০ আগস্ট সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে প্রতিবাদ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি উত্থাপিত হয়। ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম, মংলা ও চাঁদপুর বন্দরে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোদের গেরিলা আক্রমণে ৯টি পাকিস্তানি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯৭১-এর ২৩ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যেমন কামালপুর, নকশী, ধলই, জয়মনিরহাট, পটিয়া বাজার, সালদা নদী, বিলোনিয়া, রৌমারী ইত্যাদি এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীকে ক্রমাগত আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করতে থাকে।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস অত্যাচারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে নভেম্বরের শেষে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যা, নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর অনেক দেশ এবং মানুষ সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত এবং নিকোলাই পদগর্নির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মধ্যরাতে জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা দেন।

১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর জয়লাভ অব্যাহত থাকে। যশোর শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যশোর জনসভায় ভাষণ দেন। ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত হয় এবং ভারতীয় ছত্রী সেনারা ১৪ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী (কাদেরিয়া বাহিনী) ঢাকা অবরোধ করে। সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার দোসর আল বদর ও আল শামস নৃশংসভাবে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি এবং যৌথ বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন উপসেনাপ্রধান তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

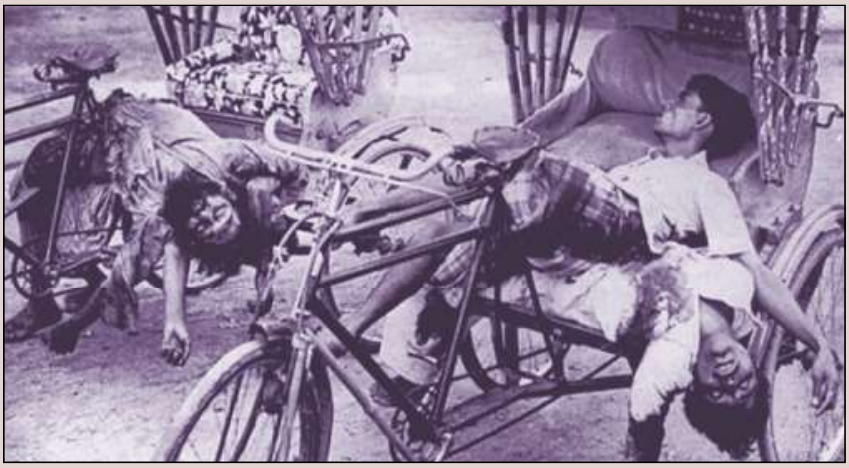

২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাক বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা

মুজিবনগর সরকার

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর (বৈদ্যনাথতলায়) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এমএনএ। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, অর্থ-বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র-কৃষি-ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামানকে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এছাড়া সংবাদপত্র, তথ্য ও বেতার চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় এমএনএ আবদুল মান্নানকে।

১৯৭১ এর মে মাসে কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়। ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এমএনএ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। ১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনসংযোগ ও দেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১১ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে আঞ্চলিক প্রশাসক নিযুক্ত করে।

দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১: নুরুল ইসলাম চৌধুরী; দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-২ : জহুর আহমদ চৌধুরী; পূর্ব অঞ্চল : লে. কর্নেল এমএ রব; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ : দেওয়ান ফরিদ গাজী; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-২ : সামছুর রহমান খান শাহজাহান; উত্তর অঞ্চল : মতিউর রহমান; পশ্চিম অঞ্চল-১ : মোহাম্মদ আবদুর রহিম; পশ্চিম অঞ্চল-২ : আশরাফুল ইসলাম মিয়া; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-১ : আবদুর রউফ চৌধুরী; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২ : ফণীভূষণ মজুমদার; দক্ষিণ অঞ্চল : আবদুর রব সেরনিয়াবাত।

সরকারি প্রশাসন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সরকারি কর্মকর্তাগণকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

রুহুল কুদ্দুস (সেক্রেটারি জেনারেল), হোসেন তওফিক ইমাম (ক্যাবিনেট), নূরুল কাদের খান (সংস্থাপন), মাহবুবুল আলম চাষী/আবুল ফতেহ (পররাষ্ট্র), খন্দকার আসাদুজ্জামান (অর্থ), এম.এ. সামাদ (প্রতিরক্ষা), নূরউদ্দিন আহমদ (কৃষি), এ. খালেক (স্বরাষ্ট্র), আনোয়ারুল হক খান (তথ্য), ডা. টি. হোসেন (স্বাস্থ্য), অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সদস্য সচিব ত্রাণ-পুনর্বাসন), এ. হান্নান চৌধুরী (আইন)।

এছাড়া ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীকে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা মনোনীত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী
তাজউদ্দীন আহমদ

মন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমেদ

মন্ত্রী
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

মন্ত্রী
এএইচএম কামারুজ্জামান

প্রধান সেনাপতি
জেনারেল এমএজি ওসমানী

সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ

বাংলাদেশ সরকার সেপ্টেম্বর মাসে সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। এর সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ, ভাসানী), সদস্যবৃন্দ– মণি সিংহ (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমেদ (ন্যাপ, মুজাফ্ফর), তাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের আরও দুজন সদস্য।

যুক্তরাজ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে লন্ডনসহ সমগ্র যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ১ মার্চ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে ২৬ মার্চ থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এপ্রিল মাস থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসেন। তিনি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ৯ মাস মুজিবনগর সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানত ভারতের কলকাতা শহরের নানা অংশে অবস্থিত ছিল।

মুজিবনগর সরকার : বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যক্রম

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠিত হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় গড়ে ওঠে। কলকাতা ছিল বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র।

শেক্সপিয়র সরণি (১৯৭১-এ এই সড়কের নাম ছিল থিয়েটার রোড) : প্রবাসী সরকারের প্রধান দপ্তর ছিল এখনে। এই ঠিকানায় ক্যাবিনেট, প্ল্যানিং, অর্থ, তথ্য ও বেতার, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছিল। এখানে বসতেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী, প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড : বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাজ এখান থেকে পরিচালিত হত। এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন মতিউর রহমান।

সার্কাস এভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) : পররাষ্ট্র, আইন এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এখান থেকে পরিচালিত হত। পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। আবদুল মান্নান, এমএনএ ছিলেন সংবাদ, তথ্য ও বেতার চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্বে।

৩/১ ক্যামাক স্ট্রিট : এখানে এপ্রিল মাসে রিলিফের কাজ শুরু হয়। এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

৪৫ প্রিন্সেপ স্ট্রিট (পোস্ট অফিস ভবন) : মে মাসে এখানে রিলিফ অফিস স্থানান্তরিত হয়। যুব অভ্যর্থনা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও লিয়াজোঁ দপ্তর ছিল এখানে। এখানে বসতেন

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন

স্বরাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্ট্রিট : এখানে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা দপ্তর অবস্থিত ছিল।

২/বি লর্ড সিনহা রোড : প্রথম বাংলাদেশ সরকারের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আশ্রয়স্থল ছিল, পরে বিএসএফ-এর সদর দপ্তর ছিল।

১৪৪ লেনিন সরণি : মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী বাংলাদেশের লেখক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ২৫ মে স্টুডিও স্থাপিত হয়। এমএনএ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় এখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

২১/এ বালু হাক্কাক লেন : এখানে বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র 'জয় বাংলা' পত্রিকার কার্যালয় ছিল।

প্রতিরোধ যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ থেকে ১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সশস্ত্র বাহিনীর ১১ জন কর্মকর্তার অধিনায়কত্বে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে।

১নং সেক্টর : মেজর রফিকুল ইসলাম, ২নং সেক্টর : মেজর খালেদ মোশাররফ, তিনি আহত হলে মেজর এ টি এম হায়দার, ৩নং সেক্টর : মেজর কে এম শফিউল্লাহ, তিনি এস ফোর্স অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলে মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান, ৪নং সেক্টর : মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, ৫নং সেক্টর : মীর শওকত আলী, ৬নং সেক্টর : উইং কমান্ডার এম কে বাশার, ৭নং সেক্টর : মেজর নাজমুল হক, তিনি শাহাদত বরণ করলে লে. কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান, ৮নং সেক্টর : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম. আবুল মঞ্জুর, ৯নং সেক্টর : মেজর এম এ জলিল, ১০নং সেক্টর : কর্নেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে বিশষ সেক্টর (নৌ কমান্ড), ১১নং সেক্টর : মেজর আবু তাহের।

৩টি ব্রিগেড গঠন : মুক্তিযুদ্ধের সময় নিম্নলিখিত ৩টি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়।

জেড ফোর্স : অধিনায়ক, লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান (ব্রিগেডের অধীন ছিল যথাক্রমে ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২ ফিল্ড ব্যাটারি)। গঠনের তারিখ ও স্থান : ৭ জুলাই, ১৯৭১, তেলঢালা।

কে ফোর্স : অধিনায়ক লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ, তিনি আহত হলে মেজর আবু সালেক চৌধুরী (ব্রিগেডের অধীনে ছিল যথাক্রমে ৪, ৯ ও ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, (মুজিব ব্যাটারি)। গঠনের তারিখ ও স্থান : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, হাজামারা।

এস ফোর্স : অধিনায়ক, লে. কর্নেল কে.এম. শফিউল্লাহ (ব্রিগেডের অধীনে ছিল যথাক্রমে ২ ও ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট)। গঠনের তারিখ ও স্থান : ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, হাজামারা।

বিমান বাহিনী : ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযোদ্ধা পাইলট ও টেকনিশিয়ান দ্বারা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনের কাজ শুরু হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় ১টি পুরনো ডিসি-৩ (ডাকোটা বিমান), ১টি ওয়াটার বিমান ও ১টি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার পাওয়া যায়। ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটি পরিত্যাক্ত রানওয়েতে বিমান সৈনিকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রশিক্ষিত এই বাহিনী পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর মোগলহাট, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, চৌগাছা, গোদনাইল, পতেঙ্গা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, জামালপুর, নরসিংদীর অবস্থানগুলোর উপর সাফল্যজনক বিমান হামলা চালায় এবং শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

নৌ কমান্ডো ও নৌবাহিনী : বাঙালি নাবিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা নৌকমান্ডো ও নৌবাহিনী সংগঠিত করা হয়। ১০নং সেক্টরকে নৌ অঞ্চল হিসেবে সংগঠিত করা হয়। পাকিস্তানিদের দখলকৃত নৌবন্দরগুলোর কার্যকারিতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নৌকমান্ডো গঠন করা হয়েছিল।

২৭ মে ভারতের পলাশীতে ৮ জন নৌবাহিনীর নাবিকসহ ৩৫৭ জন নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০ জনে।

১৯৭১-এর আগস্ট মাসে অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নৌকমান্ডোরা শত্রুর বহু জাহাজ ক্ষতিসাধন করে। চট্টগ্রামে নৌ হামলা, হিরণ পয়েন্টে মাইন আক্রমণ, চালনা বন্দর আক্রমণ, চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ বন্দর আক্রমণ ইত্যাদি অপারেশনে শত্রুর অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

নারী মুক্তিযোদ্ধা : মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের

১৯৭১ সালে ভারতে অস্থায়ী বাংলাদেশ মিশন

সার্কাস এভিনিউ, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কলকাতা

জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সাথে সেক্টর কমান্ডারবৃন্দ

নারীরা শুধুমাত্র সেবা ও প্রেরণার যোগান দেননি। তারা সম্মুখ সমরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই জনযুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে নারীরাও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ২জন নারী মুক্তিযোদ্ধা– যথাক্রমে তারামন বিবি ও ক্যাপ্টেন সিতারা রহমান বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

বিএসএফ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে ৪ জন যুব নেতার যৌথ নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএফএল) নামে একটি পৃথক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে এই বাহিনী মুজিব বাহিনী নামে অভিহিত হয়। প্রাথমিকভাবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতারা এই বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে ছিলেন। বিএলএফ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল ভারতের তান্দুয়া ও জাফলং-এ। এই দুটো প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রায় ৪,০০০ জন ছাত্র ও যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১০টি সেক্টর এলাকার সমন্বিতভাবে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই বাহিনীর সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন পূর্ব অঞ্চলে শেখ ফজলুল হক মনি, উত্তর অঞ্চলে সিরাজুল আলম খান, পশ্চিম অঞ্চলে আব্দুর রাজ্জাক, দক্ষিণ অঞ্চলে তোফায়েল আহমেদ।

টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী : অবরুদ্ধ বাংলাদেশে টাঙ্গাইল জেলায় কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় একটি গেরিলা বাহিনী। স্থানীয় ছাত্র জনতার সহযোগিতায় কাদেরিয়া বাহিনীর ১৭ হাজার যোদ্ধা ও ৭২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দেশের অভ্যন্তরে থেকে ব্যাপক এলাকা মুক্তাঞ্চল হিসেবে রাখতে সমর্থ হয়। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম টাঙ্গাইলের খন্দকার বাতেনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী সক্রিয় ছিল।

মোহাম্মদ ফরহাদ ও চৌধুরী হারুনুর রশীদ-এর নেতৃত্বে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

প্রতিরোধ শিবির : বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে ভারতের ৪টি রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য গড়ে ওঠে ৮১৫টি প্রতিরোধ শিবির।

ভাসানী সমর্থক বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন : শুরুতে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিপ্লবী হাই কমান্ড টাঙ্গাইলে আলাদা যুদ্ধ শুরু করলেও তারা কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তবে এদের একটি অংশ নরসিংদীর শিবপুরে আব্দুল মান্নান ভূইয়ার নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। এখানে রাশেদ খান মেনন, কাজী জাফর, হায়দার আকবর খান রনো, আতিকুর রহমান সালুরা যুক্ত ছিলেন।

ক্র্যাক প্লাটুন, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর গেরিলা দল : ঢাকা শহর ও তার আশপাশে চোরাগুপ্তা ও ক্ষুদ্র আক্রমণের লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকটি গেরিলা দল গঠন করা হয়। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ক্র্যাক প্লাটুন, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর গেরিলা দল। ২নং সেক্টরের মেজর হায়দারের নেতৃত্বে এই দলটি গঠিত হয়। তাদের উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড আক্রমণ, ঢাকার ৫টি ১১ কেভি পাওয়ার স্টেশন ধ্বংস, যাত্রাবাড়ী ব্রিজে এক্সপ্লোসিভ চার্জ, হামিদুল হক চৌধুরীর প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপ্লোসিভ চার্জ, বিডিআর গেট/ধানমন্ডি আক্রমণ, নিউ মার্কেটের কাছে পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন স্থানে গ্রেনেড আক্রমণ, আর্মি রিক্রুটিং অফিস আক্রমণ ইত্যাদি। এই আক্রমণগুলোর সংবাদ বিদেশি প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং গণহত্যা শুরু করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, পুলিশ, মুজাহিদ, ছাত্র, শিক্ষক এবং সর্বস্তরের মানুষ যার যা ছিল তা নিয়ে তাদের প্রতিহত করা শুরু করে। ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া সম্মেলনের পর পাকিস্তানি হানাদারের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধকৌশল স্থির করা হয়। সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের বেশ কিছু স্থানে গড়ে তোলা হয় মুক্তিবাহিনী শিবির।

বাংলাদেশ সেনা সদর দপ্তর : কলকাতার শেক্সপিয়র সরণিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দপ্তর ছিল এই অফিস। কর্নেল এমএজি ওসমানী ছিলেন প্রধান সেনাপতি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশক্রমে প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণবিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ১৯৭১-এর ১১ জুলাই মুজিবনগরে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ও যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোর গঠনের তারিখ ছিল ১৯৭১-এর ১২ জুলাই।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর সদর দপ্তর (১১টি) : ১নং সেক্টরের সদর দপ্তর–**হরিণা;** ২নং সেক্টরের সদর দপ্তর **মেলাঘর;** ৩নং সেক্টরের সদর দপ্তর-**মনতলা;** ৪নং সেক্টরের সদর দপ্তর-প্রথমে **করিমগঞ্জ,** পরে **মাছিমপুর** ৫নং সেক্টরের সদর দপ্তর–**বাঁশতলা;** ৬নং সেক্টরের সদর দপ্তর **বুড়িমারী;** ৭নং সেক্টরের সদসর দপ্তর–**তরঙ্গপুর;** ৮নং সেক্টরের

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন সিতারা রহমান

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান
অধিনায়ক : জেড ফোর্স

লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ
অধিনায়ক : কে ফোর্স

লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ
অধিনায়ক : এস ফোর্স

সদর দপ্তর–**কল্যাণী;** ৯নং সেক্টরের সদর দপ্তর–প্রথমে **হাসনাবাদ** ও পরে **টাকী;** ১০নং সেক্টরের সদর দপ্তর–**কলকাতা;** এবং ১১নং সেক্টরের সদর দপ্তর–মহেন্দ্রগঞ্জ।

যুবশিবির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১১০/১১১টি : যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তরুণ ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

প্রধান ট্রেনিং ক্যাম্পসমূহ (২টি) : প্রধান ট্রেনিং ক্যাম্প দুটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে অবস্থিত ছিল।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (মুজিব বাহিনী) : ৪টি সেক্টরে বিভক্ত এই ফোর্সের অফিস ছিল ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, আগরতলা ও মেঘালয়ে। কেন্দ্রীয় কমান্ডার ছিলেন তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মনি।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহিলা ক্যাম্প : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গোবরা ক্যাম্পে বেগম সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) ভূমিকা : প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মার্চ মাসেই গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের কাছে দাবি জানান। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির অধীনে বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস পেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে তিনবার ভোট প্রদান করেছিলেন।

শরণার্থী শিবির

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারে নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমানা পেরিয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

৩১ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান ও প্রতিরোধ তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দুর্গত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানান। ১৫-১৬ মে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী লক্ষ লক্ষ বাঙালি শরণার্থীর দুঃখ-দুর্দশা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। ভারতও বিশ্ববাসীর কাছে নিরপরাধ মানুষের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরে। ১৯৭১-এর ২৪ মে ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন–

‘এত অল্প সময়ে এই বিপুল জনসংখ্যার দেশত্যাগ ইতিহাসে নজিরবিহীন। গত ৮ সপ্তাহে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এই জনসমষ্টির মধ্যে রয়েছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান; প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও নানা বয়সের মানুষ। প্রচলিত অর্থে এদের ‘উদ্বাস্তু’ বলা চলে না, যদিও দেশভাগের সময় থেকেই আমরা এই উদ্বাস্তু কথাটির সাথে পরিচিত। প্রকৃত অর্থে এরা হলেন যুদ্ধের শিকার, যারা সামরিক সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে সীমানা পেরিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে।’

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ লক্ষাধিক। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশ, বিশেষ করে রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে আশ্রয়প্রাপ্ত বিশালসংখ্যক শরণার্থীদের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ২৮ জুলাই ‘ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি ইমারজেন্সি মিশন’ (ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশ শরণার্থী সংক্রান্ত)’ -এর চেয়ারম্যান মি. এনজিয়ার বিডল ডিউক মার্কিন সরকারের নিকট প্রদত্ত তার রিপোর্টের এক অংশে উল্লেখ করেন–

‘যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, তথাপি হিন্দু জনসাধারণই ছিল এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য। হিন্দু, ভারত ও তাদের সমর্থকরাই পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দায়ী বলে সামরিক জান্তা মনে করে। যে সকল মুসলমান হিন্দুদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের একাংশকেও বাধ্য করেছিল হিন্দুদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি পোড়ানো ও লুট করতে, এ কাজ না করলে তাদেরও হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল।’

১৩ আগস্ট মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সফর করেন এবং শরণার্থী-জনগণের দুর্দশা দেখে বলেন, ‘It is the greatest human tradegy of our time.’

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস অত্যাচারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে নভেম্বর মাসের শেষে ভারতে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি। ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। শরণার্থীরাও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরতে শুরু করেন।■

ব্যক্তি নয়, দল ও দেশকেই বেশি প্রাধান্য দেই

ফজলুর রহমান খান ফারুক চেয়ারম্যান– টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ

সাক্ষাৎকার : ফেরদৌস সালাম ● বিদ্যুত খোশনবীশ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে টাঙ্গাইলের রাজনীতিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজেদের তারকা ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন তাদেরই একজন টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান খান ফারুক। তিনি ২০১১ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান খান ফারুক এর জন্ম ১৯৪৪ সালের ১২ অক্টোবর টাঙ্গাইলের থানা পাড়ায় এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা মরহুম আব্দুল হালিম খান এবং মা ইয়াকুতুন্নেছা খানম। ফজলুর রহমান খান ফারুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। কিশোর বয়সেই ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে টাঙ্গাইল মহকুমা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল শাখার সভাপতি নির্বাচিত এবং ১১ দফা আন্দোলনে কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য গঠিত সর্বদলীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৭০ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং টাঙ্গাইলের বয়োকনিষ্ঠ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মির্জাপুর থেকে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ফজলুর রহমান খান ফারুকের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে আছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল দখলের জন্য যাত্রা করলে ফজলুর রহমান খান ফারুক ৩ এপ্রিল ছাত্র যুব-সমাজসহ অল্প ক'জন ইপিআর সদস্য নিয়ে গোড়ান সাটিয়াচড়ার পাকা রাস্তায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহতসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এটিই ছিল মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের প্রথম সম্মুখ সমর। পরে তিনি ১৮ এপ্রিল ভারতে যান এবং মেঘালয়ের তুরায় ১১ নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টারে পলিটিক্যাল মটিভেটরের দায়িত্ব পালন করেন। পরে মুজিব বাহিনী গঠিত হলে তিনি টাঙ্গাইল জেলা মুজিব বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর গণ পরিষদ সদস্য হিসেবে সংবিধান প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মির্জাপুর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি টাঙ্গাইল জেলা বাকশাল এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজপথের লড়াকু সৈনিক।

২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি ২০১১ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে অদ্যাবধি টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমান খান ফারুকের জীবন নানাভাবেই বৈচিত্রময়। তিনি সাংবাদিকতার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাকের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি টাঙ্গাইল মহকুমা মফস্বল সংবাদদাতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ফজলুর রহমান খান ফারুক টাঙ্গাইল ক্লাব, করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব, টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগার, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, টাঙ্গাইল হার্ট ফাউন্ডেশন ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য। তিনি বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাসহ টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য। বর্তমানে তিনি জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচিত সভাপতি। তিনি ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান সফর করেছেন। তার লিখিত গ্রন্থ 'কেন সংগ্রাম করি' টাঙ্গাইলের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ আলোচিত।

দেশের কৃতি সন্তান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান খান ফারুক এ বছর 'একুশে পদক' অর্জন করেছেন। প্রত্যয়কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি একজন প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ-বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে টাঙ্গাইলের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ গোড়ান-সাটিয়াচড়ার নায়কদের একজন। এই যুদ্ধের শহীদ ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : ১৯৭১ থেকে ২০২১ । ৫০ বছর আগের হলেও ঘটনাটি মুক্তিযুদ্ধের বলে সব মনে আছে। ২৫ মার্চ ঢাকায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর আমরা বুঝতে পেরেছিলাম হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইলের দিকে আসবে। এর আগে দেশের অবিসংবাদিত জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্ট বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে হানাদার বাহিনীকে আমরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গোড়ান সাটিয়াচড়ায় প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মাত্র কয়েকজন ইপিআর ও সাধারণ ছাত্র-জনতা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারেনি। পাকিস্তানি হানাদাররা গোড়ান-সাটিয়াচড়ায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। শত শত মানুষকে তারা গুলি করে হত্যা করে এবং বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে সব ধ্বংস করে ফেলে। হানাদার বাহিনীর এটি ছিল বড় ম্যাসাকার। স্বাধীনতার পর আমরা এই দু'গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আমেরিকার দুটি এনজিও কেয়ার এবং ভেরিতাস এর সাথে কথা বলি। এই দুটো সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম গোড়ান ও সাটিয়াচড়াকে মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। তারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেয়। গ্রাম দুটোতে ১৪২টি ঘর তৈরি করে দেয়। না পুড়িয়ে মাটির ইট দিয়ে দেয়াল এবং টিনের চাল দিয়ে তৈরি করা হয় এই ঘরগুলো।

গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যাতে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হতে পারে এজন্য তারা গ্রামটিকে সমবায়ী গ্রাম হিসেবেও গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়– তারা এখানে কোঅপারেটিভ দোকান চালুর পরিকল্পনা হাতে নিলো। তারা আশ্বাস দিলো রাস্তাঘাটও নির্মাণ করে দেবে। ইলেকট্রিসিটি দেবে, মানুষ যাতে সাধারণ উন্নত ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেবে। এভাবে একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে ঘরগুলো হয়েছিল। তারা শুরু করলেন ১৯৭৩-৭৪ সালে। এর মধ্যে ৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করলেন। এরপর ৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনককে পরিবার-পরিজনসহ নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশের অনেক কার্যক্রম, অনেক পরিকল্পনাই স্থবির হয়ে যায়। আমেরিকান এই এনজিওরাও তাদের এই পরিকল্পনা আর এগিয়ে নেয়নি, পরবর্তীতে কয়েক দশক চলে গেছে কোনো কাজ হয়নি।

২০১১ সালে আমি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হবার পর গোড়ান-সাটিয়াচড়ার কিছু জায়গা সরকারের নামে খারিজ করে সেইখানে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি রিসোর্টের মতো ৩ তলা বিল্ডিং করেছি। এর নীচতলায় ভাড়া দেয়া হয়, দোতলা ও তিন তলায় কয়েকটা রুম করেছি থাকার জন্যে যাতে কেউ বাইরে থেকে গিয়ে অবস্থান করে। সেই দিনের ভয়াবহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের নারকীয়তার ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে।

আমরা ১৪২ জন শহীদের নাম খুঁজে পেয়েছিলাম, তাদের নামের তালিকা সম্বলিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ

করা হয়েছে, এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক করে দিয়েছেন। এর আগ পর্যন্ত কোনো সরকারই এই প্রতিরোধ যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানটি নিয়ে কোনো কিছু করেনি। বর্তমানে এই স্থানটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মৃতিগ্রাম হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে।

প্রত্যয় : আপনি বলেছেন, বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বেশ ক'জন ইপিআর সদস্যসহ যুদ্ধরত ছাত্র জনতা শহীদ হয়। তাদের জন্যে বিশেষ কোনো স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে কি?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : যে ৫ জন ইপিআর সদস্য সেখানে শহীদ হয়, তাদের কবর চিহ্নিত করে সেসব কবর বাঁধাই করে রাখা হয়েছে। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ২৫ মার্চের পর গোড়ান-সাটিয়াচড়াই এদেশের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ। এর স্মৃতিকে আরো গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা উচিৎ বলে আমি নিজেও মনে করি।

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করেন এই প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনা পাঠ্য বইয়েও তুলে ধরা উচিত যাতে নতুন প্রজন্ম এই মুক্তিযুদ্ধ সময়ের নিরস্ত্র মানুষদের সাহসকে জানতে পারে?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : অবশ্যই, এ ধরনের সাহসী ঘটনাগুলো আমাদের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন– যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। সে সময় সাধারণ মানুষের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। আমাদের বাঙালি ইপিআরদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল, তাও খুব উন্নতমানের নয়। আমরা সাধারণ মানুষ ছাত্র-যুবক-জনতা যখন প্রতিরোধের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসি তখন বাঙালি ইপিআর ভাইয়েরা আমাদের সাথে অংশ নেন। গোড়ান-সাটিয়াচড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে শত শত ছাত্র যুবক জনতা দেশি বন্দুক, দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু মূলত যুদ্ধ করেছেন ইপিআর সদস্যরাই। তারাই সেদিন পাকিস্তানি হানাদারদের কনভয়কে গুলি করে উল্টে দিয়েছেন। তারা বুঝতেই পারেনি তাদের প্রতিরোধের মধ্যে পড়তে হবে। আমরা যারা নির্বাচিত এমপি ও এমএনএ ছিলাম এবং আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য মুক্তিকামী দলের নেতৃত্বে ছিলাম সবাই মিলে কয়েকদিন ধরে এ এলাকায় বাঙ্কার খনন করে শত্রুর মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইল দখল করতে আসবে। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাদের অনেক সৈন্য মারা যায় এবং তারা বুঝতে পারে যে অতি সহজে তারা বিভিন্ন স্থান দখল করতে পারবে না, যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রত্যয় : এখানে যুদ্ধরত অবস্থায় কয়েকজন ছাত্র নেতা ও যুবকও শহীদ হয়েছেন– তাদের কোনো স্মৃতি স্তম্ভ নেই?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : জ্বী না, নেই। তারা যেহেতু স্থানীয় এলাকার– নিজ নিজ গ্রামে তাদের কবর রয়েছে।

প্রত্যয় : টাঙ্গাইলের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি কেমন ছিল?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : ২ এপ্রিল ইপিআর বাহিনীর লোকেরা পাকবাহিনীকে সম্মুখ সমরে মোকাবেলার জন্যে পাকা রাস্তার দু'পাশে ট্রেন্চ (বাঙ্কার) করে ডিফেন্স বসাতে চায়। স্থানীয় জনগণ হাটবাজার, স্কুল এবং লোকালয়ে তা করতে মানা করে। এ নিয়ে বিতন্ডা হয়। পরে আমার উদ্যোগে জামুর্কি থেকে সরিয়ে গোড়ান-সাটিয়াচড়াকে পেছনে রেখে আছিমতলার কাছাকাছি যেখানে খোলা মাঠ এবং লোকবসতি কম সেখানে ট্রেন্চ করে প্রস্তুতি নেয়া হয়।

একজন সুবেদারসহ সাতজন ইপিআর, ছাত্র, যুবক, জনতা, আনসার, পুলিশ এবং প্রাক্তন মিলিটারিসহ প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ঐ রণক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, আমাদের কাছে ২টা ব্রিটিশ এলএমজি, তিনটা সাব মেশিনগান, ২টা এসএলআর, প্রায় ১০০টির মতো থ্রি নট থ্রি, দোনলা বন্দুক, একনলা বন্দুক ও গাদা বন্দুক এবং এর সঙ্গে বেশ কয়েক বাক্স গুলি ও ম্যাগাজিন ছিল।

সাধারণ মানুষ, ছাত্র, জনতা এ সকল ট্রেন্চ খুড়তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের খাবার সরবরাহেও মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। আমি সাটিয়াচড়ার আওয়ামী লীগ নেতা নসিবুর রহমান ছানা মিয়ার বাড়িতে রাত কাটাই এবং ভোর ৫টায় ফজরের নামাজ শেষ করে রণক্ষেত্র দেখতে আসি। এসে দেখি ইপিআর সদস্যসহ মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেন্চে অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমিও তাদের একটিতে অবস্থান নেই।

প্রত্যয় : আপনি গোড়ান-সাটিয়াচড়া প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যতম নায়ক। ৩ এপ্রিলের সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিটুকু জানতে চাচ্ছি–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : ৭১ এর ৩ এপ্রিল। টাঙ্গাইল তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক দিন। ঐ দিন সমস্ত এলাকাবাসী জনগণের মন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত এবং সন্ত্রস্ত ছিল। নিজের অনুভূতি দিয়ে বুঝেছিলাম ঐ দিনের ভোরের আকাশ, মৃদুমন্দ বাতাস সবকিছুই কেমন যেন ভারাক্রান্ত। বেদনার ছায়া আকাশে আবরণ তৈরি করে রেখেছিল। হঠাৎ পাকবাহিনীর শত শত গাড়ির বহর লক্ষ লক্ষ ভ্রমণের গুঞ্জনের মতো শব্দ করে অত্যন্ত ধীর গতিতে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হচ্ছে। পাকবাহিনীর সবচেয়ে বড় লরি আছিমতলা ব্রিজের ওপর উঠেছে। দেখলাম, পাকিস্তানের সেনা সদস্যরা পায়ে হেঁটে অস্ত্রহাতে

সামনের দিকে এগোচ্ছে। আমরা প্রস্তুত, যুদ্ধের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম। আমাদের পক্ষ থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হলো। হঠাৎ বিমান বাহিনীর একটি ছোট বিমান এসে ঘুরে গেলো। আমাদের গোলাবর্ষণ চলছে। শত্রুপক্ষ নীরব।

আধঘণ্টার ওপরে আমাদের দুটি এলএমজি এবং অন্যান্য অস্ত্রগুলো বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। দেখলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বহু সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হলো। নিহতও হয়েছে হয়তোবা। আমি যে বাঙ্কারে অবস্থান করছিলাম সে বাঙ্কারে অবস্থানরত ইপিআর এর সুবেদার সাহেব যে এলএমজি চালাচ্ছিল, হঠাৎ করে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। সুবেদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হলো। তিনি বললেন, স্যার, এলএমজি চালাতে গেলে কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেক সময় ট্রিগার পিন ভেঙে যায় অথবা গ্যাস চেম্বারে গ্যাস জমে যাওয়ার কারণে অস্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই অস্ত্র ঠিক করতে যে সময় লাগবে এর মধ্যে পাকবাহিনী আমাদের পরাভূত করে এগিয়ে যাবে। পাকবাহিনী গোলা বর্ষণ শুরুর আগেই আপনি এলাকা ত্যাগ করুন। আপনি জনগণের নেতা। আপনার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। তিনি অনেকটা ঠেলেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন নিরাপদে যেতে।

ইতোমধ্যে পাকবাহিনী বিপুল পরাক্রমে নানাবিধ আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। অটোমেটিক মেশিন গান, লাইট মেশিনগান, সাব মেশিনগান, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, মর্টারসহ বিভিন্ন অস্ত্রে গোলাবর্ষণ করতে থাকল। আমরা হতবিহ্বল হয়ে রণে ভঙ্গ দিলাম। সকলে যার যার অস্ত্র নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ স্থানে চলে গেলাম। শুধু ইপিআর এর বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং প্রত্যেকে শহীদ হলো। আমি যে বাঙ্কারে ছিলাম সেই সুবেদার আব্দুল খালেকও কিছুক্ষণের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব। তারা সত্যিই দেশপ্রেমিক।

প্রত্যয় : ৩ এপ্রিলের সেই যুদ্ধের পর পাকবাহিনী কতোটা নৃশংস আচরণ করেছিল– যদি স্মৃতি থেকে বলেন।

ফজলুর রহমান খান ফারুক : ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। আগেই বলেছি ইপিআর সদস্যরা ছাড়া আমাদের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা আহত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে চলে যান। এই বাঁধা পেয়ে পাকবাহিনী ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো গোড়ান, সাটিয়াচড়া, পাকুল্লাবাজার, পাকুল্লা ও জামুর্কি গ্রামসহ রাস্তার আশপাশের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নিরস্ত্র, নিরীহ নারী পুরুষ ও শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। গোড়ানের বীর মুক্তিযোদ্ধা করটিয়া সা'দত কলেজের ছাত্রলীগ নেতা জুমারত হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা নিমাই ও আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে আসা রংপুরের ভকু চৌধুরীসহ অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিন পাকবাহিনী যে রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে তা হিটলারের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়। অন্য কোথাও বাধা না পেয়ে পাকবাহিনী ২টার পর টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করে।

প্রত্যয় : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে তার কতোটা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষের শেকড়ঘনিষ্ঠ নেতা। তিনি একটি সুখী সমৃদ্ধ স্বাধীন সোনার বাংলার স্বপ্ন আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই জাতিকে স্বাধীন হবার প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি এমন একটি দেশ চেয়েছেন যা হবে স্বনির্ভর এবং প্রতিটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থনের নিশ্চয়তা থাকবে। তিনি সেই লক্ষ্যেই স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় বিপ্লবের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৭৫ সালে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড দেশের উন্নয়ন ধারাবাহিকতা বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নকে বাঁধাগ্রস্ত করে ফেলে। আশার কথা, দীর্ঘ সংগ্রাম-আন্দোলনের পর জাতির জনকের কন্যা আমাদের লৌহমানবী নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন আজকের বাংলাদেশে তার বাস্তবায়ন ঘটেছে– দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা এখন স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছি। একটি মানুষকেও আজ অনাহারে থাকতে হয় না। আমাদের মাথাপিছু আয় ২২০০ ডলার ছাড়িয়েছে।

এক সময় এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র ছিল– তা আজ ২২ ভাগে নেমে এসেছে। আপনি গ্রামে যান, গরিব মানুষ খুঁজে পাবেন না। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হওয়ায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে উন্নতি করছি বিশ্বও কিন্তু তা প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখছে। আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমি আশাবাদী বাংলাদেশ একদিন উন্নত দেশের কাতারে জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে।

১৯৬০ সালে বঙ্গবন্ধুর অফিসে তরুণ ফজলুর রহমান খান ফারুক

প্রত্যয় : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আশ্বাস দিয়েছিলেন কোনো মানুষই গৃহহীন থাকবে না। এ জন্যে তিনি গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আপনাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : আপনি ঠিকই বলেছেন, বঙ্গবন্ধু গৃহহীন মানুষদের জন্য গুচ্ছগ্রাম শুরু করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ সময় পর হলেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম পর্যায়ে গৃহহীনদের জন্য ঘর প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পে বড় ঘর করে তিন জনকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এদের মধ্যে পারিবারিক মেলবন্ধন তৈরি হবে। কিন্তু দেখা

গেল তাতে তাদের অনেকেই খুশি হতে পারেনি। এ জন্যে এখন আলাদা আলাদা ঘর প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১ লাখের অধিক ঘর করা হয়ে গেছে। আরো হচ্ছে। আমরা টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও ৫০টি ঘর করে দিচ্ছি। প্রতি ঘরের জন্য সরকারি বাজেট রয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা– এই টাকায় আমরা বাড়িঘর করে দেব। সরকারের মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নেই আমরা সহযোগিতা করছি।

প্রত্যয় : আপনি ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী, ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রথম আপনার কবে দেখা হয়?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : তখন আমি বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলে পড়ি। সম্ভবত ৫৩-৫৪ সালের দিকে। বঙ্গবন্ধু টাঙ্গাইল আসলেন– লাগা কাজ করতো। আমি এরপর ১৯৬০ সালে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হই।

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়, ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। তখন এতো কাউন্সিলর পাওয়া যেতো না। সম্মেলন হলে আমরা যারা বিভিন্নভবে নেতাদের সাথে পরিচিত ছিলাম তাদের নাম কাউন্সিলর হিসেবে দিয়ে দিতো–আমরা মিটিংয়ে উপস্থিত হতাম। এরকম সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। আইয়ুবের মার্শাল 'ল সময়ে বঙ্গবন্ধু অলকা ইন্স্যুরেন্সের পূর্ব পাকিস্তানের চীফ ছিলেন। অফিস ছিল জিন্নাহ এভিনিউতে দোতলায়, যা এখন বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। আমি ১৯৬০ সালে মেট্রিক পরীক্ষা দেই। একদিন বঙ্গবন্ধুর অফিসে গেলাম, সাথে ক্যামেরা। বঙ্গবন্ধুর সাথে একটা ছবি তুললাম। সেই ছবিটা এখনো আমার কাছে আছে।

নাগরপুর যাবেন সভা করতে। তখন এত গাড়ি ঘোড়া ছিল না। তিনি হেঁটেই রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে টাঙ্গাইলের মুকুল সাহেব, শাজাহান সাহেব, বদিউজ্জামান সাহেব, নুরুল হুদা সাহেব, কালা খোকা ভাই এরাও ছিলেন। আমরা অল্প বয়সের ছেলেপেলেরাও তাদের পেছনে পেছনে গেলাম।

রাস্তায় এলাসিন ঘাটে গেলে তিনি আমাদের দেখে কিছু মুড়ি আর গুড় কিনে দেন– আমরা সবাই খেলাম। সেই তখন নেতার সাথে পরিচয় ঘটলো। তখনো আমি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হইনি। তবে সোহরাওয়ার্দী সাহেব, মওলানা ভাসানী সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও শেখ মুজিবের প্রতি একটা কৌতূহল ও ভালো

প্রত্যয় : বঙ্গবন্ধুর সাথে সে সময় আর কোন কথা হলো?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : আমি তখন টাঙ্গাইল থেকে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হতে ইচ্ছুক। আমি জানতাম, ওনার সাথে ইত্তেফাকের ভালো সম্পর্ক। বললাম, মুজিব ভাই, টাঙ্গাইলে ইত্তেফাকের সাংবাদিক নেই, আপনি যদি ইত্তেফাকে একটা টেলিফোন করতেন। উনি তখন ইত্তেফাকের সিরাজউদ্দিন হোসেন সাহেবকে টেলিফোনে বলে দিলেন। আমি ইত্তেফাকে গেলাম। তিনি সাথে সাথে ইত্তেফাকের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি হিসেবে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিলেন। আমি সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পেলাম।

প্রত্যয় : আপনি রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিক হিসেবেও বেশ আলোকিত ছিলেন, যার পেছনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনেক–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : একদম সত্যি। অনেকদিন আমি টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম, টাঙ্গাইল মফস্বল সাংবাদিক সমিতির সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট ছিলাম।

প্রত্যয় : ২৫ মার্চ ঢাকায় ম্যাসাকারের পর বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার একটা টেলিগ্রাম তখনকার মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ যা বর্তমানে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ– সেখানে আসে। আপনি তা সংগ্রহ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে শুনেছি–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : আপনারা ঠিকই শুনেছেন। আমি তখন মির্জাপুরের নির্বাচিত এমপিএ এবং টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি। আর আনোয়ার উল আলম শহীদ হলেন সাধারণ সম্পাদক। ২৬ মার্চ আমি জানতে পারি, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে আমাকে টেলিফোনে খোঁজ করা হয়। আমি সকালেই মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে যাই এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ম্যাসেজটা এনে শহীদকে দেই, শহীদ এটা মাইকযোগে টাঙ্গাইলে প্রচার করতে থাকে।

প্রত্যয় : যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক স্মৃতিই জমে আছে– এর মধ্য থেকে দু'একটি ঘটনার কথা বলুন?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : আমি এবং প্রিন্সিপাল হুমায়ুন খালিদ এমএনএ সাহেব– আমরা দু'জন তখন ভারতের তুরা ক্যাম্পে পলিটিক্যাল মটিভেটরের দায়িত্বে নিয়োজিত। সে সময় একজন পাকিস্তানি সৈনিক ভারতীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়লো। ভারতীয় বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সেক্টরে কর্নেল রাও ছিলেন চার্জে। ব্রিগেডিয়ার সানৎসিং ছিলেন প্রধান। কর্নেল রাও ছিলেন ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। কর্নেল রাও এসে আমাদের বললেন, 'ফারুক সাহাব, এক বাত হ্যায়'। এক পাকবাহিনীতো ইধার পাকড়াও লিয়া আয়া– মাগার বাত এয়ি হ্যায় ও কুছ নেহি খাতা– তিন চারদিন ধরে ও কিছুই খাচ্ছে না। ও বলতা হ্যায়, কাফের কো সাথ মুসলমানকো কোয়ি বাত নেহি। অর্থাৎ কাফেরদের সাথে মুসলমানের কোনো কথা নেই। এছাড়া আর কোনো কথাও হয় না। কর্নেল রাও অনুরোধ করায় আমি আর হুমায়ুন খালিদ সাহেব তাদের ক্যাম্পে গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যটিকে বললাম– হাম লোগ মুসলমান হ্যায়। হুমায়ুন খালিদ তো ইসলামের মানুষ। হুমায়ুন খালিদ সাহেব সুরা ইয়াসিন থেকে শুরু করলেন। না, ব্যাটার এক

কথা– কাফেরকো সাথ কোয়ি বাত নেহি। এরপর তিনি সুরা আর রাহমান ও সুরা বাকারা থেকে পড়ে শোনালেন– না বেটার খালি ঐ এক কথা। আসলে সে নামে মুসলমান, কোরআনের ক-ও জানে না। আমরা তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। তার কাছে সেই এক বাত...। এ অবস্থায় কর্নেল রাও বললেন, ওকে তো আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব না। যদি খেতো তাহলে ওকে কোনো জেলখানায় পাঠিয়ে দিতাম। ওকে মেরে ফেলতে হবে। যদি খেতো তাহলে না হয় বাঁচিয়ে রাখা যেতো। এই এক অদ্ভুত মুসলমানের কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

এর মধ্যে আরেকজন ধরা পড়লো খুব অল্প বয়সের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট। কর্নেল রাও আবার যেতে বললেন, গেলাম। ছেলেটি ইংরেজি ও উর্দু জানে। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। ছেলেটি বললো, তাকে জেলখানায় দেয়া হোক। বুঝলাম সে চাইছে নিরাপদ থাকতে। জেলখানায় কেউ তাকে মেরে ফেলবে না। একদিন না একদিন সমস্যার সমাধান হলে সে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি পাবে। সে জানায়, তার কোনো দোষ নেই– তাকে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছে। আমরা ব্রিগেডিয়ার সানৎসিংকে বলে সেই ব্যবস্থা করে দেই।

প্রত্যয় : ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয় সেখানে এমপি হিসেবে আপনারও স্বাক্ষর রয়েছে– বর্তমানের সংবিধান তা থেকে কতোটা ব্যতিক্রম?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : বিগত সময়ে সংবিধানের অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হলেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দুটো বিষয় বাদে প্রায় আগের ধারাই বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি জিয়াউর রহমানের 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এই দুটো বিষয়ে হাত দেয়া যায় না– কারণ সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া আমরা ৭২ সংবিধানের ধারায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছি।

প্রত্যয় : স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতা মধুপুর বনবিভাগের রেস্ট হাউসে বসে সংবিধান রচনা করেছিলেন বলে কারো কারো মন্তব্য–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : কথাটা আংশিক সত্য। বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ নেতারা এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। সংবিধান নিয়ে আলোচনাও করেছেন, কিন্তু এখানে তা রচনা করা হয়নি।

প্রত্যয় : বর্তমানে আপনি টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। আপনার কাছে টাঙ্গাইলের উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : দেখুন, আমি বলবো বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সারাদেশেই উন্নয়ন হচ্ছে। টাঙ্গাইলেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবং হচ্ছে। কেউ দেখে কেউ দেখে না। কেউ দেখেও বিশ্বাস করে না। এই দেশ ছিল ভিক্ষুকের দেশ। বঙ্গবন্ধুর পরে যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা কেউ বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা হাতেই নেয়নি। জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আরোহন করে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনাগুলো একের পর এক বাস্তবায়ন করছেন। ফলে পৃথিবীতে এখন বাংলাদেশ একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে। এই দেশ সকল মূল্যায়নেই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি সত্যিই অমিত সম্ভাবনার একটি দেশ। শেখ হাসিনা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ এর কথা বললেন তখন অনেকেই সমালোচনা করেছেন কিন্তু বাস্তব এটাই যে দেশে ডিজিটাইজেশনের উন্নয়ন এখন চোখে পড়ার মতো। আমরা পদ্মা সেতু করেছি, হাইওয়ে রাস্তাগুলো হচ্ছে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে– এরকম শত শত প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের চেহারা পরিবর্তন হচ্ছে–বাংলাদেশ পরিণত হচ্ছে স্বনির্ভর সোনার বাংলায়।

প্রত্যয় : আপনি একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। সাবেক এমপি, বর্তমানে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি–

ফজলুর রহমান খান ফারুক : আমাদের নিজস্ব চিন্তা বা পরিকল্পনা বলতে কিছু নেই। ব্যক্তি নয়, দল ও দেশকেই বেশি প্রাধান্য দেই। আমাদের নেত্রী, বিশ্বমানবতার নেত্রী শেখ হাসিনারও নিজের কোনো চিন্তা নেই। তিনি দেশ ও জনগণের উন্নয়ন চিন্তাকে ধারণ করেই পরিকল্পনা নেন। নেত্রীর সেই চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা আমাদেরও পরিকল্পনা।

প্রত্যয় : স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিভিন্ন সেক্টরের পাশাপাশি এনজিও সেক্টরও দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এটিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের পাশাপাশি এনজিওরাও বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমি মনে করি, তারা দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করেন। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করছেন– এটি নিঃসন্দেহে দেশের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক দিক। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যয় : আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন নানাভাবেই বর্ণাঢ্য– আপনি কি স্মৃতিকথা লেখার ইচ্ছে করেন?

ফজলুর রহমান খান ফারুক : অবসর পেলে মানুষ লিখতে পারে। রাজনীতিবিদরা সেরকম অবসর পান কিনা জানি না। তবে লেখার ইচ্ছা আছে।■

পাকিস্তান সরকারের হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট

একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যা ধর্ষণ লুটপাট ও ম্যাসাকারের প্রামাণ্য দলিল

রফিকুল ইসলাম রতন

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে বাঙালি হত্যা, নারী ধর্ষণ, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপকহারে লুটপাট চালিয়েছে। যখন তখন নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশুদের তারা গুলি করে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম তারা পুড়িয়ে ছাড়খার করেছে। সংখ্যালঘু পরিবারের হাজার হাজার সদস্যকে গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে। এসব নির্মম হত্যাকান্ডের পর কোথাও গণকবর, আবার কোথাও শত শত লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের অসংখ্য গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ নিষ্ঠুর ও নির্মম ঘটনার বর্ণনা রয়েছে খোদ পাকিস্তান সরকারের 'হামুদুর রহমান তদন্ত কমিশন' রিপোর্টেই। নিয়াজিসহ জেনারেলদের নৈতিক অধঃপতন, ব্যভিচার, নারী কেলেংকারি, মদ্যপান, চোরাচালান, দুর্নীতি, লুটপাট ও নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যা পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশারফ ২০০০ সালের ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিভাবে প্রকাশ করেন। গবেষণার জন্য কমিশনের রিপোর্টটি বর্তমানে ইসলামাবাদের 'ন্যাশনাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার লাইব্রেরিতে' সংরক্ষিত রয়েছে।

অথচ সেই পাকিস্তান সরকারই আজ ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি ঘটিয়ে অতীত ভুলে এবং তাদের সরকারের 'হামুদুর রহমান তদন্ত কমিশন' এর রিপোর্টকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করছে। 'একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে কোনো গণহত্যা হয়নি' বলে তারা মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে। বিগত ৩০ নভেম্বর '১৫ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসলামাবাদে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলরকে ডেকে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, পাকিস্তান একাত্তরে কোনো গণহত্যা তো করেইনি, কোনো দুষ্কর্মেও তারা সহযোগিতা করেনি।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যে একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যাসহ পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে, তার জন্য ২০০২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশারফ ঢাকায় এসে দুঃখ প্রকাশও করেন। ওই সময়েই পাকিস্তানের ৫১টি মানবাধিকার সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চায় এবং পাকিস্তান সরকারকেও আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলে। ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটসেও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে কম সময়ে বেশি গণহত্যা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল মিডিয়া এবং খোদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেলদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইতেও গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। অথচ এ সব কিছুকেই উপেক্ষা করে আজ পাকিস্তান সরকার রীতিমত মিথ্যাচার শুরু করেছে।

লিবারেশন ডকুমেন্ট, কমিশন রিপোর্ট, ইন্ডিয়া টুডে ও অন্যান্য অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, হামুদুর রহমান কমিশনের ৬৭৫ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্টটি হুবহু পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশ না করে পাকিস্তান সরকার রিপোর্টের ১৪৪ থেকে ২১২, ২৩৬ থেকে ২৩৭ এবং ৪৪১ থেকে ৪৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গোপন রেখে প্রকাশ করেছে। গবেষকরা বলছেন, উল্লেখিত গোপন অংশে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ও অত্যাচার নির্যাতনের বীভৎস বিভিন্ন ঘটনা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকটি দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে অনেক স্পর্শকাতর বিষয় উল্লেখ থাকায় ওই পৃষ্ঠাগুলো অপ্রকাশিত ও গোপন রেখেই প্রকাশ করা হয়েছে কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট। জানা যায়, ওই সময় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনুদ্দিন হায়দার চৌধুরীর নেতৃত্বে

পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সমন্বয়ে যে রিভিউ কমিটি করা হয়, তাদের সুপারিশেই উল্লেখিত অংশগুলো গোপন রেখে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়।

পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর 'পাকিস্তান কমিশন অব ইনকোয়েরি অ্যাক্ট ১৯৫৬-এর অধীনে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে প্রধান করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। হামুদুর রহমান কমিশন 'যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়, দেশ ভেঙ্গে যাওয়া, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের কারণ, দায়িত্ব ও নেতৃত্বে অবহেলা, গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন বিষয় তদন্ত করে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্যই গঠিত হয় এই কমিশন। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন, লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুর রহমান। এই কমিশনটি 'হামুদুর রহমান কমিশন' নামেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত। কমিশনে লে. জেনারেল (অব.) আলতাফ কাদিরকে সামরিক সচিব ও পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সহকারি রেজিস্ট্রার এমএ লতিফকে সচিব নিয়োগ করা হয়। কমিশনের লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন কর্ণেল এমএ হাসান। ওই সময় প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স'ও অনুমোদন করে দেন। ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরের কমিশন অফিসে গোপন শুনানি এবং ২১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ১৯৭২ সালে প্রাথমিক রিপোর্টটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে জমা দিয়ে কমিশন সুপারিশ করে যে, আত্মসমর্পনকারী যুদ্ধবন্দিদের সাক্ষ্য ছাড়া পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি সম্ভব নয়। পরবর্তিতে কমিশনের সময় বৃদ্ধি করা হয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজিত যুদ্ধবন্দিরা ১৯৭২ সালের ২ জুলাই ইন্দিরা-ভুট্টোর সিমলা চুক্তির মাধ্যমে ভারত থেকে ফিরে আসার পর তাদের চিহ্নিত ও অভিযুক্ত ৭২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন। (যদিও ওই সময় পাকবাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধিকে ফেরত না দেয়াসহ তাদের বিচারের কথাও ওই চুক্তিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিতে ভুট্টো সে কথা আর রাখেননি)। সর্বশেষ ১৯৭৪ সালের ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশন রিপোর্টটি হস্তান্তর করে। প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো রিপোর্টটি হাতে পেয়ে এবং রিপোর্টের বিষয়বস্তু জেনে ভয় পেয়ে যান। তিনি বছরখানেক রিপোর্টটি গোপন করে রাখেন। ভুট্টো ভেবেছিলেন যে, এটি প্রকাশ পেলে সেনাবাহিনীর সাথে তার জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই সুচতুরভাবে তিনি ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝিতে প্রচার করেন যে, কমিশন রিপোর্টটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সর্বপ্রথম হামুদুর রহমান তদন্ত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় পত্রিকা 'ইন্ডিয়া টুডে'র ওয়েবসাইটে। পরের দিন পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি ডেইলি ডন পত্রিকাতেও রিপোর্টটি ছাপা হয়। তখন জানা যায় যে, এটি রক্ষিত ছিল পাকিস্তান আর্মি ও জেনারেলদের সদরদপ্তরের কমান্ডেন্ট হেডকোয়ার্টারে। পরবর্তীতে এটি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জিয়াউল হকের রেকর্ড সেকশন থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রকাশ হওয়ার পর ওই সময় রিপোর্ট নিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে রীতিমত হৈচৈ শুরু হয়। পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন মিডিয়ায় ওই কমিশন রিপোর্টকে উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপক লেখালেখিও শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ বা উচ্চবাচ্য করেনি। তাদের নিশ্চুপ থাকাই প্রমাণ করে ওই রিপোর্টই আসল কমিশন রিপোর্ট। এই তিন দেশের রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার পর সমগ্র বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে 'নরপিশাচ' হিসেবেই চিহ্নিত করে। ফলে অনেকেই রিপোর্টটি প্রকাশের তীব্র বিরোধিতাও করে। পরবর্তীতে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশারফ হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টটি উন্মুক্ত করেন।

তদন্ত কমিশন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি, পূর্বাঞ্চলীয় নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার কমডোর ইনাম, লে. জেনারেল এসজিএমএম পীরজাদা, লে. জেনারেল গুল হাসান, মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী, লে. জেনারেল টিক্কা খান, মে. জেনারেল উমর, মে. জেনারেল মিঠ্ঠা খান, মে. জেনারেল খোদাদাদ খান, মে. জেনারেল আব্দুল মজিদ, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ, চিফ সেক্রেটারি মোজাফ্ফর হোসেন, ব্রিগেডিয়ার আতা মোহাম্মদ, ব্রিগেডিয়ার বাকের সিদ্দিকী, পুলিশের আইজি এম মাহমুদ আলী চৌধুরীসহ সামরিক-বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জিওসি, কোম্পানি কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডারসহ সাধারণ সৈনিকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করে।

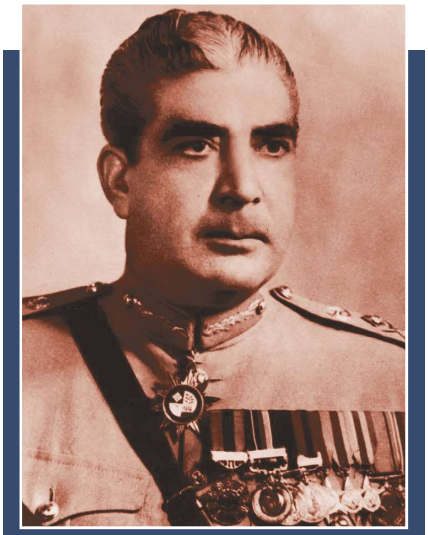

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান অখণ্ড পাকিস্তানের অপরিনামদর্শী শেষ শাসক।

রিপোর্টে সাক্ষীদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজিসহ উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের নৈতিক অধঃপতন, ব্যভিচার, নারী কেলেংকারি, মদ্যপান, চোরাচালান, দুর্নীতি, লুটপাট ও নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

জেনারেল নিয়াজি কমিশনের কাছে ১৫ লাখ বাঙালিকে হত্যার কথা স্বীকার করেছিলেন বলে ১৯৭৪ সালের ২১ আগষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়াসহ বাংলাদেশের সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক বাংলা ও ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কমিশনের কাছে তিনি রিপোর্টের ৭ম অধ্যায়ের ১৮তম অনুচ্ছেদে সাক্ষীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ছিলেন একজন দুর্নীতিপরায়ণ, দুঃশ্চরিত্র ও ঔদ্ধত্য প্রকৃতির লোক। নারী সংসর্গ ও মদ্যপানে আসক্ত ইয়াহিয়ার প্রায় সময়েই হিতাহিত জ্ঞান থাকতো না। চূড়ান্ত মদ্যপ এই লোকটি মাতাল ও নারী বেষ্টিত হয়ে চিন্তা ও বোধশক্তিহীন অবস্থায় যেসব রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত দিতেন, তার প্রায় সবই ভুল ছিল। প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের মত দুই গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির এই স্খলনই পাকিস্তানের ধ্বংস ডেকে আনে। কমিশন তার রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দুই শতাধিক নারীর অনৈতিক সম্পর্কের সন্ধান পেয়ে তাদের নাম পরিচয়ও উল্লেখ করে। ওইসব নারী প্রেসিডেন্টের অতিথিশালাকে নিজের বাড়ির মত ব্যবহার করতেন বলেও কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। নারী সংসর্গের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে কমিশনের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কাউকে না বলতে পারি না।' তিনি ওইসব নারী সংসর্গে অনৈতিকভাবে উপার্জিত বিপুল পরিমাণে অর্থ দু'হাতে বিতরণ করতেন, যার বেশিরভাগই ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে লুটের মাল। ইয়াহিয়া তার অনুগতদের দিয়ে নিয়মিতভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিন্ন নামে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে পান

রফতানি কিংবা পাচার করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলেও অসংখ্য সাক্ষী তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন।

কমিশনের রিপোর্টে জেনারেল নিয়াজির দুর্নীতি, কুখ্যাতি ও লাম্পট্যের নানা কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। নিয়াজি শিয়ালকোট এবং লাহোরের জিওসি ও সামরিক আইন প্রশাসক থাকাকালেই ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাপক দুর্নীতি, বহু নারীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, মদ্যপানে আসক্তি ও অধস্তনদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছে কমিশন। তার অধীনস্ত অর্ধশত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তার স্বাক্ষীর ভিত্তিতে কমিশন উল্লেখ করেছে, পূর্ব পাকিস্তানে নিয়াজি নারী কেলেংকারিতে কুখ্যাতি অর্জন করেন। জুনিয়ার অফিসারদের সঙ্গে তিনি নৈশবিহারে মদ্যপান ও নারী সংসর্গে মেতে থাকতেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে পান পাচার করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সুবিধা নিয়েছেন। বন্দিদশা থেকে

পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট তুলে দিচ্ছেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমান। এই প্রতিবেদনকে আলোর মুখ দেখতে দেননি ভুট্টো।

ফেরত পাক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য থেকে নিয়াজির যৌন নির্যাতন, নারী কেলেংকারি, অর্থলুটপাট, পাচার, বাঙালির ওপর নিষ্ঠুর আচরণসহ ভয়ংকরসব তথ্য পায় কমিশন।

নবম ডিভিশনের জিওসি লে. কর্নেল মনসুরুল হক, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার এ এ খান, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সাবেক কমান্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডিয়ার আই আর শরিফ, ঢাকার সাবেক অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ আশরাফ, মে. জেনারেল কাজী আব্দুল মজিদ, লে. কর্ণেল আজিজ আহমেদ খান, ব্রিগেডিয়ার আতা মোহাম্মদ খান, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকের সিদ্দিকীসহ অর্ধশত সাক্ষী কমিশনকে লিখিত ও মৌখিকভাবে বলেন যে, কমান্ডার (নিয়াজি) নিজেই যেখানে ধর্ষক, নারী নির্যাতনকারী, লুটেরা, অর্থপাচারকারী এবং নিষ্ঠুর ও বর্বর হত্যাকান্ডের নির্দেশ দাতা, সেখানে অধস্তন কর্মকর্তা ও সৈনিকরা অবশ্যই এর চেয়ে বহুগুণে বেশি অপকর্ম করবে এবং ঠিক তাই করেছে। তারা কমিশনের কাছে প্রশ্ন রেখেছে, ওই অবস্থায় কাউকে কি নিবারণ করা সম্ভব? তারা কমিশনকে বলেন, নিয়াজি মদ্যপ ও সার্বক্ষণিক নারী বেস্টনী অবস্থায় যেসব নির্দেশ-আদেশ দিতেন, তার প্রায় সবই উল্টো ফল হতো। যা যুদ্ধের জন্য ছিল চরম আত্মঘাতী।

কমিশনকে মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মে. জেনারেল জামশেদ বলেন, লে. জেনারেল এএকে নিয়াজি স্পষ্টতই তার পূর্বসূরী লে. জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ভয়ংকর ও চরম বিশৃংখল হয়ে ওঠেন। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি (নিয়াজি) জুনিয়ার অফিসারদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা রেশনের অভাবের কথা কেন বলছ ? পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কি কোন গরু, ছাগল, চাল, আটাসহ টাকা পয়সা নেই? তোমাদের যখন যা প্রয়োজন সবই ওদের কাছ থেকে নিয়ে নিবে।' দায়িত্ব নেয়ার মাত্র চারদিন পর নীতিনির্ধারিক পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের তিনি নারী ধর্ষণ, লুটপাট, নির্বিচারে হত্যা ও অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দেন। সাক্ষীরা সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে বলেন, নিয়াজির নির্দেশের পর পিআইএ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় প্রতিদিনই ফ্রিজ, এসি, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, ক্রোকারিজ, স্বর্ণালংকার, দামি শাড়ি ও কাপড়-চোপড়, বাসার আসবাবপত্র এমনকি দামি দামি গাড়িও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতো। যার প্রতিটি জিনিসই ছিল বাঙালিদের বাসাবাড়ির লুটের মালামাল। নিয়াজি সমগ্র দেশেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের বেছে বেছে হত্যারও নির্দেশ দেন বলেও সাক্ষীরা উল্লেখ করেন। অবশ্য নিয়াজি কমিশনের কাছে এসব অস্বীকার করে শুধু বলেন, নারী-পুরুষ কাউকেই তিনি ফিরিয়ে দেননি। আর যা কিছু নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুর নির্দেশদাতা ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান, তিনি নন। কমিশনের কাছে রাও ফরমান আলী সুস্পষ্ট করে বলেন, 'তিনি বহু ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও অপমানজনক আচরণের ভয়াবহ বিবরণ পেয়েছেন।'

কমিশনকে লে. জেনারেল মনসুরুল হক বলেন, মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কাউকে ধরা হলেই তাকে বাংলাদেশে (অর্থাৎ পরপারে) পাঠিয়ে দেয়া হতো। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াই তখন কোড হিসাবে বাংলাদেশ ব্যবহার করে গুলি করে হত্যা করা হতো, সে সংখ্যা যাই হোক। জেনারেল হক বলেন, দেখামাত্র হিন্দুদের হত্যার মৌখিক নির্দেশও তিনি পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম ডিভিশনের জিওসি থাকার সময়ে ২৭ ও ২৮ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাসে একজন বাঙালি অফিসারসহ ৯১৫ বাঙালিকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল। সালদা নদীতে ৫ শতাধিক নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করে লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল বলেও সাক্ষী দেন তিনি।

ব্রিগেডিয়ার ইকবালুর রহমান শফি তার সাক্ষ্যতে বলেন, 'যুদ্ধের সময় একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কতজন বাঙালি হত্যা করেছো। যে যত বেশি হত্যা করেছে, অত্যাচার চালিয়েছে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করতে পেরেছে, সে তত প্রশংসা পেত।'

লে. কর্ণেল আজিজ আহমেদ খান সাক্ষ্যতে বলেন, 'ব্রিগেডিয়ার আবরাব, তাকে জয়দেবপুরের সব বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং এ নির্দেশ তিনি বহুলাংশেই পালন করেন।' কর্নেল আজিজ আরও বলেন, ঠাকুরগাঁও ও বরগুনায় তার ইউনিট পরিদর্শনে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কতজন হিন্দু মেরেছ? ২৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ মালিক হিন্দুদের হত্যা করার জন্য তাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও কমিশনকে জানান তিনি।'

ব্রিগেডিয়ার শাহ আব্দুল কাশেম কমিশনকে বলেন, '২৫ মার্চ ঢাকার রাজপথে কোনো খন্ডযুদ্ধ হয়নি। ওই রাতে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। অভিযানের সময় সৈন্যরা ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সে কাজটি করেছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ওই রাতে মর্টার দাগানো হয়েছিল। ফলে ঘনবসতিপূর্ণ ছাত্রাবাসে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।' কমিশনকে আরও বলা হয়, ২৫ মার্চ রাতেই শুধু ঢাকাতে ৫০ হাজারের মত মানুষ প্রাণ হারায়।

ব্রিগেডিয়ার মিয়া তাসকিন উদ্দিন কমিশনকে বলেন, 'ফায়ারিং স্কোয়াডে দুষ্কৃতকারিদের হত্যা ও দমন করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদির খান বলেন, বাঙালিদের জোর করে তুলে আনার বেশ কিছু ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ২৯ অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল

এসএসএইচ বোখারি বলেন, রংপুরে দু'জন বাঙালি অফিসারসহ ৩০ জনকে নির্বিচারে গুলিকরে মারা হয়। অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।' ৩৯ বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল এসএম নাঈম বলেন, সুইপ অপারেশনের সময় বহু নিরীহ মানুষকে আমরা হত্যা করেছি।

নবম ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল আনসারি বলেন, সিরাজগঞ্জ ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেজারি থেকে ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লুট করা হয়েছিল মেজর সাদ্দাফ হোসেন শাহ'র নেতৃত্বে। অন্য একটি স্থানে আড়াই কোটি লুটসহ বিভিন্ন স্থানে আরও বহু লুটের ঘটনার বিবরন পেয়েছে কমিশন।

রিপোর্টে উল্লখ করা হয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার এতটাই দুঃশ্চরিত্র ছিল যে, তা বর্ণনার অতীত। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, মকবুলপুর সেক্টরে ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান বাহিনী গুলিবর্ষণের সময়েও ব্রিগেডিয়ার হায়াতুল্লাহ তার বাংকারে কয়েকজন নারীকে ধর্ষণে মেতে ছিলেন।

কমিশন রিপোর্টে মে. জেনারেল জামশেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ৯ কিংবা ১০ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি ঢাকায় গণঅভ্যুত্থানের আশংকা থেকে গোয়েন্দা শাখা দিয়ে ৩ হাজার লোকের একটি তালিকা তৈরি করে।

এ প্রসঙ্গে মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী কমিশনকে বলেন, ডিসেম্বরের ৯ বা ১০ তারিখ ঢাকা বিভাগের উপ-সামরিক আইন প্রশাসক মে. জেনারেল জামশেদ তাকে পিলখানার সদর দফতরে যেতে বলেন। সেখানে তিনি অনেকগুলো গাড়ি সারিবদ্ধ দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পান। পরে তারা দু'জনেই জেনারেল নিয়াজির সদর দফতরে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, দু'এক দিনের মধ্যে তারা ঢাকাসহ সারা দেশের কিছু লোককে গ্রেফতার করতে চান।

এ ব্যাপারে নিয়াজিকে কমিশন থেকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, স্থানীয় কমান্ডাররা তার কাছে কিছু লোকের তালিকা নিয়ে আসেন। সেখানে কিছু দুষ্কৃতকারি ও মুক্তির নাম ছিল। কোন বুদ্ধিজীবীর নাম ছিল কিনা জানিনা। (বুদ্ধিজীবী পরিবারের সাক্ষ্য, তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া, বুদ্ধিজীবীসহ অসংখ্য লাশ উদ্ধার ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, জামায়াতে ইসলামি ও আল বদর বাহিনীর পরামর্শে ওই সময়েই ঢাকাসহ সারা দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরি করে তা ১৩ ডিসেম্বর মধ্য রাতে কার্যকর করা হয়)।

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক রবার্ট পেইনের 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে জেনারেল নিয়াজির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, 'পাকিস্তানের জেনারেলদের এক কনফারেন্সে ইয়াহিয়া ৩০ লাখ বাঙালি হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' লন্ডনের সানডে টাইমসের সাংবাদিক অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহাসের 'জেনোসাইড : ফুল রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনেও পাকিস্তানী জেনারেলদের ব্যক্তিগত হিসাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আড়াই লাখ বাঙালি নিধনের কথা উল্লেখ করা হয়। এসব কোন রিপোর্টেরই আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ করেনি পাকিস্তান সরকার। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং তার প্রথম রিপোর্ট 'ট্যাংকস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' শীর্ষক প্রতিবেদনে পাকিস্তানী বাহিনী ঠান্ডা মাথায় মাত্র ২৪ ঘন্টায় ঢাকার কয়েকটি এলাকায় ৭ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে। বিস্তীর্ণ এলাকা তারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এক সঙ্গে জড়ো করে ব্রাশ ফায়ার করে মারা হয়েছে। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, হাট-বাজার। ১৯৯৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল রাও ফরমান আলী পাকিস্তান বাহিনীর হাতে ৫০ হাজার বাঙালি হত্যা হতে পারে বলে স্বীকার করেন।)

হামুদুর রহমান কমিশন সুপারিশ করে যে, নেতৃত্বের ব্যর্থতা, দেশ ভাঙ্গা, দুর্নীতি, চরিত্রহীনতা, অনৈতিক কার্যকলাপ, মদ্যপানে আসক্তি, দুঃশ্চরিত্রপনা, বাংলাদেশে বর্বর ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগসহ নানাবিধ অপকর্ম ও দায়িত্বের ব্যর্থতার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, লে. জেনারেল পীরজাদা, লে. জেনারেল গুলহাসান, মে. জেনারেল উমর, মে. জেনারেল খোদাদাদ খান ও মে. জেনারেল মিঠঠাসহ অন্যান্যদের প্রকাশ্য বিচার হওয়া উচিত।

তাছাড়া বাংলাদেশে ব্যাপক লুটপাট, নারী ধর্ষণ, ধনসম্পদ আহরণসহ একই ধরনের অপরাধে কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্ব পালনকারি নয়জন সেনা কর্মকর্তার কোর্ট মার্শালেরও সুপারিশ করে কমিশন। তারা হলেন, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি (তার বিরুদ্ধে ১৫ টি অভিযোগ উত্থাপন করে কমিশন), লে. জেনারেল ইরশাদ খান, ঢাকাস্থ ৩৬ ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ, চাঁদপুরের ৩৯ এডহক ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল এম রহিম খান, ১৫ ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল আবিদ জাহিদ, ১৮ ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল বিএম মোস্তফা, নবম ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল এমএইচ আনসারি, ঢাকার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জিএম বাকের সিদ্দিকী, ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব, নবম ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত ও ৩৯ এডহক ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজি।

কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন অপরাধ করায় রংপুর ও দিনাজপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৩ ব্রিগেডের কমান্ডার আনসারি, ঝিনাইদহে দায়িত্ব পালনকারি ৫৭ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমেদ, ময়মনসিংহ জেলার ৯৩ ব্রিগেডের কমান্ডার আব্দুল কাদিরকে সামরিক বাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত করে লঘু সাজা দেয়ার জন্য সুপারিশ করে।■

লে. জেনারেল টিক্কা খান
পাকিস্তানি নিষ্ঠুর জেনারেল

লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি
পাকিস্তানের পরাজিত সেনাপতি।

● লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক
সম্পাদক, স্বদেশ প্রতিদিন

একটা মানবিক বাংলাদেশ এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম

বুলবুল খান মাহবুব বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কবি

সাক্ষাৎকার : ফেরদৌস সালাম ● বিদ্যুত খোশনবীশ

বুলবুল খান মাহবুব। কবি, রাজনীতিবিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলের উপদেষ্টা ছিলেন। বাংলা ভাষার অন্যতম দ্রোহের কবি বুলবুল খান মাহবুব এর জন্ম ১৯৪২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল শহরে। তাঁর পিতা মরহুম আব্দুল করিম খান ছিলেন বৃটিশ ভারতে টাঙ্গাইলের প্রথম মুসলিম আইনজীবী। তিনি লেখক হিসেবেও ছিলেন বেশ সমাদৃত। তরফ গৌরাঙ্গীর ইতিহাস, দিল্লী-আগ্রা-আজমীর ভ্রমণ, মুসলিম পারিবারিক আইনসহ অনেক গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। তাদের গ্রামের বাড়ি ঘাটাইল উপজেলার দিঘলকান্দি। বুলবুল খান মাহবুব এর মাতা হামিদা চৌধুরানী একজন দানশীলা ও বিদ্যোৎসাহী নারী।

বুলবুল খান মাহবুবের বড় ভাই মরহুম আতাউর রহমান খান চল্লিশ দশকে লিখেছিলেন কাব্যগ্রন্থ উপসী, সুরের সমাধি, খোশ আমদেদ এবং উপন্যাস এপিঠ-ওপিঠ ও মরণকীট। তাঁর বড় বোন সোফিয়া খান চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তার চার বোনই উচ্চ শিক্ষিত এবং সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন ভাষা আন্দোলনের সাথে ।

কবি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল খান মাহবুব মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর শোষণহীন মানবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছিলেন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধে প্রথমে তিনি মওলানা ভাসানীর নির্দেশনায় বিপ্লবী হাই কমান্ডের প্রধান হিসেবে টাঙ্গাইলের বামপন্থীদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে তিনি তার দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনীতে যুক্ত হন এবং বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধকালে কাদেরিয়া বাহিনীর মুখপত্র রণাঙ্গন তার সাইক্লোস্টাইল প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো এবং তিনি এর সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন।

রাজনীতি সচেতন এই কবি মানবকল্যাণমূলক মার্কসবাদী কবিতা লেখার পাশাপাশি প্রেম, প্রকৃতি, নিঃসঙ্গচেতনা, স্মৃতিকাতরতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয় নিয়ে কবিতা লেখেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিময়তা ঘিরে তাঁর বেশ কিছু কবিতা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। যার মধ্যে 'জখমী সাথীসহ আমরা দশজন' কাব্যগ্রন্থ পাঠক মনে স্থান করে নিয়েছে।

লড়াকু রাজনীতিবিদ বুলবুল খান মাহবুবের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার থানা আক্রমণের অভিযোগে বেশ কটি মামলা দায়ের করে। ১৯৭০ সালে টাঙ্গাইলে পুলিশ-ইপিআর বনাম ছাত্র-জনতার সংঘর্ষে

তিনি কারাবরণ করেন। ষাট দশকে তাঁর অনেক কবিতাই রাজনৈতিক স্লোগান এবং গণসঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে রক্তের কারুকাজ-১৯৮৭, ত্রয়ী-২০০৫, একজন কবির মৃত্যুর আগে-২০০৮ এবং এই যৌবনে ভরা তারুণ্যে-২০১০। তার স্মৃতিকথা 'মধুর ক্যান্টিন' ও ভ্রমণকাহিনী 'উত্তর কোরিয়ার পথে-প্রান্তরে' বেশ পাঠক সমাদৃত। তিনি ২০১১ সালে আমেরিকার ফোবানা সম্মেলনে যোগদান করেন এবং আশির দশকে উত্তর কোরিয়ার লেখক সংঘের সম্মানিত সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ভারত, বার্মা, গণচীন, রাশিয়া, ইতালি, পর্তুগাল, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন।

বুলবুল খান মাহবুব সাপ্তাহিক নয়াযুগ ও চরমপত্রের সম্পাদক হিসেবে সংবাদপত্রের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তার রচিত অনেক গণসঙ্গীত এখনো আলোচিত। এর মধ্যে ফকির আলমগীরের কণ্ঠে ও সুরে 'ডলার এলো দেশে', 'ওরে আয়রে বেলা যায়রে' এবং 'আমার দরদী' অন্যতম।

মেধাবী ছাত্র বুলবুল খান মাহবুব টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনীতির মেধাবী পুরুষ, ষাটের দশকের আলোকিত কবি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল খান মাহবুব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রত্যয়কে দেয়া সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি সম্ভ্রান্ত জোতদার পরিবারে জন্ম নিয়েও দেশের দরিদ্র, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির রাজনীতিতে জড়িত হয়েছেন। এর পেছনে কোন বিষয়টি বেশি কাজ করেছে?

বুলবুল খান মাহবুব : পৃথিবীর শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান– একটি হচ্ছে– প্রগতিশীল ধারা, অন্যটি প্রতিক্রিয়াশীল। আমার পিতা ছিলেন টাঙ্গাইলের প্রথম মুসলিম আইনজীবী। বাড়িতে প্রচুর বই ছিল। আমি সেই ছাত্রাবস্থাতেই ম্যাক্সিম গোর্কির মা, নাজিম হেকমত এদের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। ব্রিটিশ আমলে এখানে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট রাজনীতি ছিল। আমাদের বাসায় বাবার সাথে সম্পর্কের কারণে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মোফাখ্খারুল ইসলাম, ভাষাবিদ মতিন, সৈয়দ আব্দুল মতিনসহ অনেক চিন্তাধারার লোকজনই আসতেন। কৃষক নেতা হাতেম আলী খানের সাথেও পরিচয় ঘটে।

এরমধ্যে ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী আহুত কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী জ্ঞানী-গুণী, বিপ্লবী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল শোষিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে। তাঁর এই রাজনৈতিক দর্শন আমাকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। এসব কারণেই আমি কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়ি। আমার মধ্যে এই চেতনাটি খুবই নাড়া দিত– যখন দেখতাম মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে বস্ত্রের অভাবে, মানবেতর জীবন যাপন করছে। তখন মনে হতো এদের এই অবস্থা থেকে সুন্দর জীবনে নিয়ে আসার জন্যে কাজ করতে হবে। এই মানুষের জন্যে কল্যাণ চিন্তাই আমাকে বাম রাজনীতি অর্থাৎ শোষিত নিপীড়িত মানুষের জন্যে রাজনীতিতে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রত্যয় : আপনি ১৯৫৭ সালের 'কাগমারী সম্মেলন' এর কথা তুলে ধরলেন। আপনি তখন স্কুলের ছাত্র হিসেবে সম্মেলনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন– এই সম্মেলন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ণ কি?

বুলবুল খান মাহবুব : এই সম্মেলন এদেশের রাজনীতির একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই সম্মেলনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, পাকিস্তান স্বাধীন হলেও আমরা স্বাধীন নই। এদেশের মানুষ যে স্বাধিকার চেতনায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল সেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি বরং বৃটিশদের পরিবর্তে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শাসন শোষণ নিপীড়নের শিকার হয়েছি।

১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী তৎকালীন সরকারে তার দলের মন্ত্রীদের দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও ন্যায় কথা বলতে দ্বিধা করেননি। এই সম্মেলনে তিনি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীকে স্পষ্ট বলে দেন– তোমরা যেভাবে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে এদেশের মানুষকে নির্যাতন নিপীড়ন শোষণ করছো, এভাবে চললে তোমাদের পথ তোমরা দেখো আমরা আর তোমাদের সাথে নেই, তোমাদের 'ওয়ালাইকুম সালাম'। তাঁর এই সাহসী উচ্চারণে সেদিনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা ওদের চেয়ে আলাদা। সেদিন পাকিস্তান ও বিশ্বের অনেক পত্রিকায় এই সংবাদটি গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়।

আমি মনে করি ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর এই ঘোষণাই আমাদেরকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মূলত সেদিনই স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়।

অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন মওলানা ভাসানীর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক অনন্য দলিল যা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পথ নির্ধারণ করে দিয়েছিলো।

প্রত্যয় : এই সম্মেলন আপনার রাজনৈতিক দর্শনকে ঋদ্ধ করে কিছু একটা করার জন্যে– তাই নয় কি?

বুলবুল খান মাহবুব : আপনারা ঠিকই বলেছেন। ৫৭ এর পর আমরা এখানে বামপন্থী ধারার ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করি। এরপর ৫৮ তে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। এ সময় আমার বিরুদ্ধে ৮টি মামলা দায়ের করা হয়। আমার অনুপস্থিতিতে সামরিক

আদালতে একটি মামলায় ১০ বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রত্যয় : ৬২'র ছাত্র আন্দোলনে আপনারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করেন?

বুলবুল খান মাহবুব : দেখুন, সামরিক জান্তা আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এ দেশের অকুতোভয় ছাত্র সমাজকে দমানো যায়নি। আমরা ৬১-৬২ সালে ভয়াবহ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলি। তখন ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন– দুটো সংগঠনই ছিল শক্তিশালী। আমাদের উভয়েরই লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। ৬২'র আন্দোলনে ছাত্রলীগের শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের কাজী জাফর আহমেদ দুর্বার নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং ছাত্র সমাজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলে সক্ষম হই।

প্রত্যয় : আপনারা মওলানা ভাসানীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন– ছাত্র থাকাকালীনই তিনি আপনাকে কৃষক সমিতির সাথে যুক্ত করেন। এর পেছনে কি কারণ ছিল?

বুলবুল খান মাহবুব : মওলানা ভাসানী এদেশের গণমানুষের রাজনীতি করতেন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে এসব মানুষকে জাগ্রত করে তাদের ক্ষমতায়নের চিন্তা ভাবনা করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এদেশের শতকরা ৮৫ জন কৃষক। সেই কৃষকদের সংগঠিত করতে না পারলে, তাদের উন্নয়ন না হলে দেশের কোনো উন্নয়ন হবে না। আবার সেই কৃষকদের শতকরা ৯৭ ভাগই শিক্ষার আলো বঞ্চিত। এ অবস্থায় তিনি আমাদেরকে কৃষক সমিতিতে যুক্ত হতে নির্দেশ দেন। তিনি চেয়েছিলেন গণচীনে যেভাবে সাধারণ মানুষ শোষণমুক্ত হবার আন্দোলনে বিপ্লবে সম্পৃক্ত হয়েছে এখানেও কৃষকদের মাধ্যমে এটি সম্ভব হবে। তিনি ভাবতেন, কৃষকরা জাগলে দেশ জাগবে।

প্রত্যয় : এই কৃষক সমিতি করায় মুক্তিযুদ্ধ মুহূর্তে কোনো ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন কি? আপনার নেতৃত্বে বিপ্লবী হাই কমান্ড কতোটা ভূমিকা রেখেছিল?

বুলবুল খান মাহবুব : কৃষক সমিতি আমার রাজনৈতিক জীবনে অনেক বৈচিত্র এনে দেয়। আমি খুব কাছ থেকে বাংলার কৃষক সমাজের মূল সমস্যাগুলোকে অনুধাবন করতে পারি। মূলত: এই কৃষক সমিতিই ছিল মওলানা ভাসানীর মূল শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই মওলানা ভাসানী আমাকে কৃষক সমিতির সদস্যদের নিয়ে বিপ্লবী হাই কমান্ড গঠনের নির্দেশনা দেন। আমি চর এলাকায় চলে আসি। যমুনা-ধলেশ্বরীর বিস্তীর্ণ চর এলাকা এক সময়কার ভয়ানক ডাকাত সর্দার কছিমউদ্দিন দেওয়ান মওলানা ভাসানীর সাহচর্যে ডাকাতি পেশা ছেড়ে দেন। ধনীদের গৃহে এবং ব্যবসায়ী নৌকায় ডাকাতির অর্থ ও মালামাল তিনি চরের দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন বলে তাকে বাংলার রবিনহুড বলা হতো। তিনি ডাকাতি পেশা ছেড়ে দেন এবং মওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছিলেন কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর সময়ে কছিম উদ্দিন দেওয়ান আমাদের বিপ্লবী হাই কমান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। আমরা সে সময় শাহজানির চর এলাকায় কাশবনে লুকিয়ে থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি লঞ্চ গুলি করে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হই। এটি ছিল বিপ্লবী হাই কমান্ডের প্রথম যুদ্ধ। পরে চৌহালী থানা আক্রমণ করে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখলে নিয়ে আসি। ভূয়াপুর থানা আক্রমণকালে আমার বাল্যবন্ধু সিরাজগঞ্জের এসডিও শামসুদ্দিন অস্ত্র ও লোকবল দিয়ে সহায়তা করেছিল।

প্রত্যয় : আপনি পরবর্তীতে বিপ্লবী হাই কমান্ডের অবলুপ্তি ঘটিয়ে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী তথা কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগদান করেন– এর পেছনে মূল কারণ কি?

বুলবুল খান মাহবুব : আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। ২৫ মার্চ হত্যাযজ্ঞের আগেই কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলে গঠিত হয় জয় বাংলা বাহিনী। আমরা তখন গঠন করেছি বিপ্লবী হাই কমান্ড। টাঙ্গাইলে সর্বদলীয়ভাবে টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এতে বদিউজ্জামান খান চেয়ারম্যান ও আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ৩ এপ্রিল

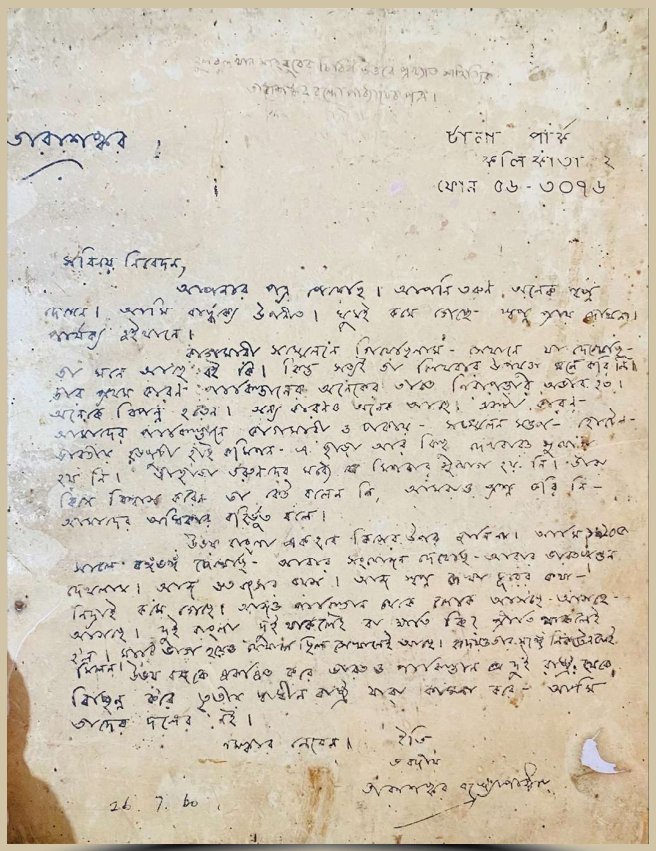

বুলবুল খান মাহবুবকে লেখা তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

গোরান-সাটিয়াচড়ার যুদ্ধ এবং কালিহাতীতে প্রতিরোধ যুদ্ধের পর গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে।

এ মুহূর্তে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি দল গড়ে ওঠে– যারা পাহাড় এলাকা ও চর এলাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে থকে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কাদেরিয়া বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী আমাকে প্রস্তাব দেন তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার। আমি এই আহ্বানে সহকর্মীদের নিয়ে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেই। তিনি আমাকে ভূয়াপুর অঞ্চলের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দেন। কাদের সিদ্দিকী সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে– অসীম সাহসী, অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী এবং নির্ভুল রণনীতি ও রণকৌশলের উদ্ভাবক। হানাদার বাহিনীর কাছে তিনি ছিলেন 'টাইগার সিদ্দিকী' নামে এক মূর্তিমান ত্রাস। তাঁর এ সকল গুণাবলীর কারণেই তিনি এক বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কাদেরিয়া বাহিনী হিসেবে পরিচিত। এ বাহিনীতে ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭২ হাজারের মতো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য ছিল।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে একথা না বললেই নয় যে, আমি তখন মনে করেছি– পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করাই অধিক জরুরি। নিজেরা আলাদাভাবে থাকলে কখনো হঠাৎ বিপর্যয় ঘটতে পারতো।

প্রত্যয় : আপনার স্মৃতি থেকে ভূয়াপুরের মাটিকাটায় হানাদার বাহিনীর অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসটি রাজন ধ্বংসের ঘটনাটি জানতে চাই–

বুলবুল খান মাহবুব : আগস্টের ১০ তারিখে কাদেরিয়া বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর একটি বার্তা পাই। তিনি জানান, আক্রমণ করলেই আক্রমণ করতে হবে। এ সময় আমাদের জানবাজ পার্টির আবুল কালাম আজাদ (পরে বীর বিক্রম) এর মাধ্যমে খবর পাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি জাহাজ ভূয়াপুরের যমুনা নদীর পথ ধরে উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছে। আমরা গোয়েন্দা মারফত তা নিশ্চিত হই। সিদ্ধান্ত নিই জাহাজ আক্রমণের। আমি এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রশাসক এ এম এনায়েত করিম অন্যান্য কমান্ডারদের নিয়ে ভূয়াপুর ডাকবাংলোয় আলোচনায় বসি। এ সময় মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার হাবিবুর রহমানকে জাহাজ ধ্বংসের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে বদর যুদ্ধের কাহিনী তুলে ধরি। তাদের বলি, আমাদের অস্ত্র কম থাকতে পারে কিন্তু আমরা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছি– ওরা হানাদার, ওদের ধ্বংস অনিবার্য। হাবিব ছিল একজন নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা। আমি এবং এ এম এনায়েত করিম বলি, এই কাজ সম্পন্ন করতে পারলে তাকে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে পুরস্কৃত করা হবে। আমার বক্তৃতায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তারা ইস্পাত কঠিন শপথ নেয় যে– জাহাজ ধ্বংস করেই তবে ফিরবে।

কমান্ডার হাবিবের নেতৃত্বে তারা মাটিকাটায় পৌঁছে যায় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজে আক্রমণ চালায়। এর আগে হাবিব জেলের ছদ্মবেশে মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে জাহাজের কাছে গিয়ে বাঙালি সারেংয়ের সাথে আলাপচারিতায় সব তথ্য জেনে নেয়। জাহাজ দখলের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য প্রচুর অস্ত্র খালাস করে শত শত নৌকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তারপর বিশাল এই জাহাজটি বাকি অস্ত্রসহ ধ্বংস করে দেয়া হয়। সে রাতে জাহাজটি ধ্বংস মুহূর্তে ভীষণ শব্দ এবং আগুনের শিখা ১৫/২০ মাইল দূর থেকে শোনা ও দেখা গিয়েছিল। আমি মনে করি, পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংসের এই ঘটনা শুধু টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধেই প্রভাব ফেলেনি, দেশের মুক্তিযুদ্ধেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল– মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল হাজার গুন।

প্রত্যয় : আপনি বামপন্থী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে যুক্ত হবার পরের যুদ্ধ স্মৃতি জানতে চাচ্ছি–

বুলবুল খান মাহবুব : জুলাই মাসে আমার সহকর্মী আশরাফ গিরানী, কমান্ডার চান মিয়া, মোহাম্মদ হাতেমসহ আরো ক'জনকে নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনীতে যুক্ত হই। এর এক পর্যায়ে কাদের সিদ্দিকীর নির্দেশে প্রবল বৃষ্টির রাতে ঘাটাইলের ধোপাজানী ব্রিজে রাজাকার ও মিলেশিয়া ঘাটি আক্রমণ করি এবং ৭ জন হানাদারকে হত্যা করে ঘাটিটি ধ্বংস করি।

গর্জনার যুদ্ধে কমান্ডার খোরশেদ আলম আহত হলে বঙ্গবীরের নির্দেশে তাঁকে নিয়ে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পাড়ি দিয়ে ঝড় বাদল উপেক্ষা করে সখীপুর মহানন্দাপুরে কাদেরিয়া বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত হাসপাতালে নিয়ে যাই।

প্রত্যয় : আপনি শুধু বীর মুক্তিযোদ্ধাই নন, একজন বিশিষ্ট কবিও। 'জখমী সাথীকে নিয়ে আমরা দশজন' কাব্যগ্রন্থের পটভূমি জানতে চাচ্ছি–

বুলবুল খান মাহবুব : চারদিকে তখন বিভিন্ন স্থানে হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ চলছে। এর মধ্যে গর্জনায় সংঘটিত হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। হানাদার বাহিনী এখানে পরাস্ত হলেও ১৪ আগস্ট কমান্ডার খোরশেদ আলম এখানে আহত হন। তাঁকে মহাসড়ক পাড়ি দিয়ে সখীপুর মহানন্দপুর নিয়ে যেতে হবে। আমিসহ দশজন সেই বৃষ্টি ও ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে আহত সাথীকে কাঁধে নিয়ে ১৫ ক্রোশেরও বেশি পাহাড়ি পিচ্ছিল উঁচু নিচু পথ পাড়ি দিয়ে মহানন্দপুর হাসপাতালে উপস্থিত হই। সে সময়গুলোতে হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ মহাসড়কে টহল বেশ জোরদার করেছিল। ভীষণ বিপদ ও আতঙ্কের মধ্যেই আমরা খোরশেদকে নিয়ে যেতে সক্ষম হই। এই পথচলা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আমার ঐ কবিতাগুলো লেখা।

প্রত্যয় : আপনি মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে মওলানা ভাসানীর অবদান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন–

বুলবুল খান মাহবুব : দেখুন, একাত্তরের স্বাধীনতা

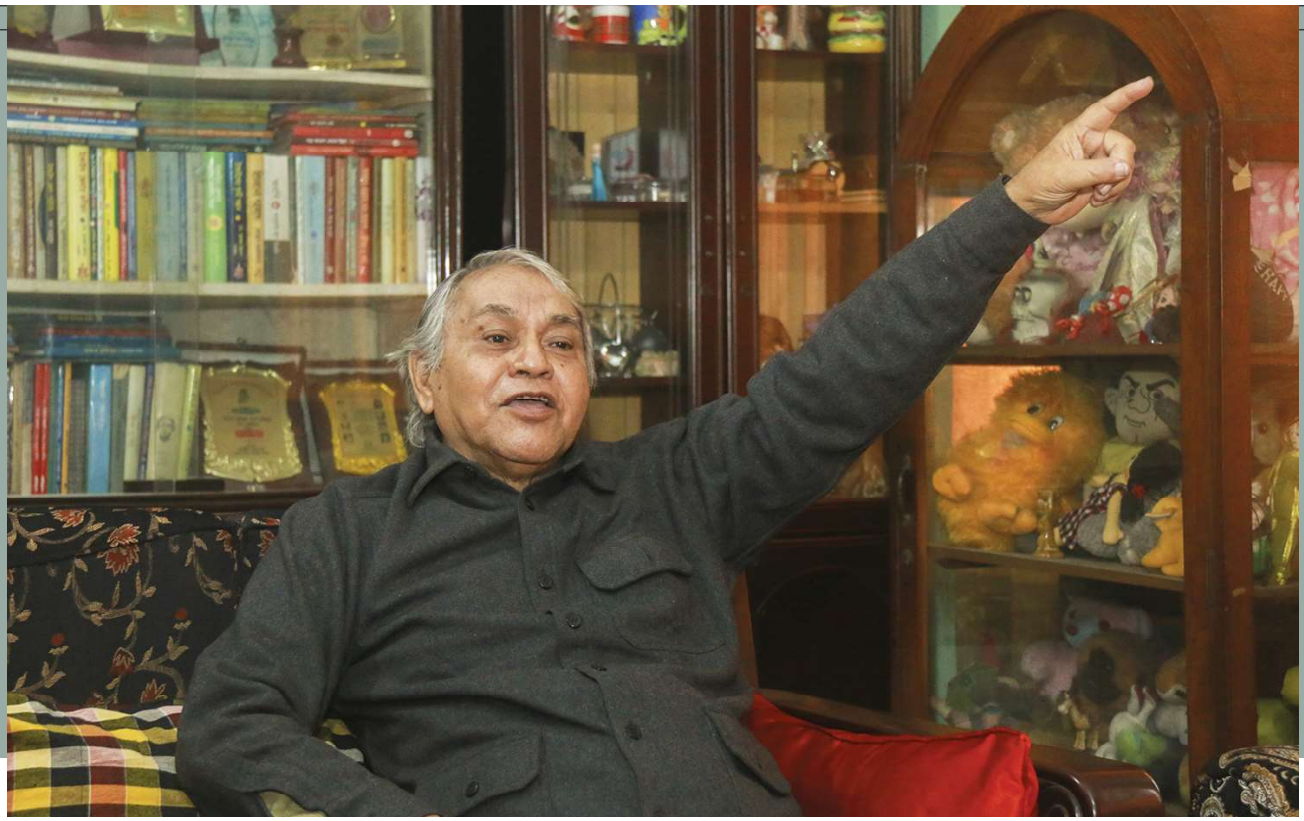

যুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এটি জানতে হলে পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমিসহ তখনকার নেতৃবৃন্দকেও জানতে হবে একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ কোনো খণ্ডিত ব্যাপার নয়। এই যুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির সামগ্রিক শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই নতুন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। সমগ্র বাঙালি জাতির জাতীয় ও স্বাধীনতার চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি প্রথম ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে এ দেশের জন্যে অনেক বেশি ক্ষমতার দাবি উত্থাপন করে বলেন, 'বৃটিশের শাসন মানি নাই, এবারও কেন্দ্রের হুকুমজারি মানব না।' ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতেও ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ১৯৫৭ সালের ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে তিনি পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি সিয়াটো-সেন্টোর বিরোধিতা করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে 'ওয়ালাইকুম সালাম' জানিয়ে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন।

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমরা যখন মওলানা ভাসানীর নিকট সিদ্ধান্তের জন্য যাই তখন তিনি স্পষ্ট বলেন, 'দেখো, আমি তো ইয়াহিয়ার দেয়া সিগন্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ভেতর নির্বাচন পূর্বেই বর্জন করেছি এবং বলেছি পশ্চিমাদের এ দেশ থেকে তাড়াতে হলে প্রয়োজন ব্যালট নয় বুলেট। তোমরা আর দেরি না করে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হও। পশ্চিমা শাসক, শোষক ও জালেম দখলদার গোষ্ঠীকে একেবারে পরাজিত করতে হবে। এ দেশকে স্বাধীন করতে হবে।

৯ মার্চ টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী মাঠে মওলানা ভাসানীকে গান স্যালুট দেয়া হয়। পাকিস্তানি পতাকায় অগ্নিসংযোগ করে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। মওলানা ভাসানী তার বক্তব্যে পশ্চিমাদের উৎখাত করতে সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানান। সেদিন আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম– গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়, গেরিলা ঘাটি গড়ে তোলো, পাক দখলদারদের খতম করো, মাতৃভূমি রক্ষা করো।

১০ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানেও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কেউ বাংলার পূর্ণ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে আপোষ করলে সে মুজিবই হোক অথবা ভাসানীই হোক পিঠের চামড়া থাকবে না। তিনি এ সভাতেও সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক দেন।

৩ এপ্রিল টাঙ্গাইলের পতন হলে রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনোসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সহকর্মীদের নিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে বিন্নাফৈরের বাড়িতে যাই। এ সময় হানাদার বাহিনী তার সন্তোষের বাড়িতে আগুন দিয়ে এদিকে আসতে শুরু করে। তখন তিনি তালপাতার টুপি নামিয়ে রেখে সাধারণ একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে বেরিয়ে যান। যাবার সময় আমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা তরুণেরা বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত হবার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে– জনতার জয় অবশ্যই হবে। পরবর্তীতে আমরা আকাশবাণীর খবরে জানতে পারি মওলানা ভাসানী ভারতে পৌঁছেছেন।

এরপর তাঁকে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, এদেশের মুক্তিযুদ্ধে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা বিশাল এবং ব্যাপক।

প্রত্যয় : আপনারা যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তার কতোটা বাস্তবায়ন ঘটেছে বলে আপনি মনে করেন?

বুলবুল খান মাহবুব : আমরা একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, মানবিক বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে কোনো দেশের মুক্তিযুদ্ধই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত শেষ হয় না। আমাদের এখানেও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই যুদ্ধ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আমরা পতাকা ও মানচিত্রের স্বাধীনতা অর্জন করেছি সত্য, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি। বিগত ৫০ বছরে আমরা এখন উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়াতে পারলেও আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকারসহ মৌলিক অনেক অধিকার থেকেই বঞ্চিত। এসব বিষয়ে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে সন্ত্রাস, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি অনেক বেড়ে গেছে। দেশে আইন ও বিচারিক শাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি।

তারপরও বলবো, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে, রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের উন্নয়ন ঘটেছে। মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর হয়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, বাল্য বিবাহ কমেছে, দেশে শিল্পায়ন বেড়েছে– এরকম অনেক অনেক উন্নয়ন ঘটছে। আশা করছি একদিন অবশ্যই আমরা শোষণমুক্ত উন্নত এক মানবিক বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হবো।■

স্বাধীন স্বদেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু

হারুন হাবীব

পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। নয় মাসের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বন্ধুরা ঢাকায় ফিরেছি। ঢাকা ফিরেই বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (বিপিআই) নামের ছোট্ট এক সংবাদ সংস্থায় যোগ দিয়েছি, রিপোর্টার হিসেবে। দিনটি ৮ জানুয়ারি ১৯৭২। সেদিনই পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাকতালীয় ভাবে আমার পূর্ণ পেশাগত জীবনের প্রথম 'রিপোর্টিং এ্যাসাইমেন্ট'ও ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর সংগ্রহের কাজ দিয়ে। নিজের বাধভাঙ্গা আবেগ এবং সেই সঙ্গে সংবাদ সংস্থার সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ আবুল ফজল হাজারীর সমর্থন; অতএব পৌঁছে গেলাম তেজগাঁও এয়ারপোর্টে লাখো মানুষের ভির ঠেলে।

পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (পিআইএ) এর বিশেষ ফ্লাইট ৬৩৫ এ চেঁপে বঙ্গবন্ধু লন্ডনের হিথরো পৌঁছলেন ৯ জানুয়ারি। ছুটে গেলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েল্থ এর কর্মকর্তারা। লন্ডনের ক্লেরিজেস হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করলেন তিনি। বললেন, "বাংলাদেশের মানুষের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশকে তিনি এক 'অমোচনীয় বাস্তবতা' বলে উল্লেখ করলেন।

লন্ডনে প্রায় ২৪ ঘন্টা অবস্থানের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। ঢাকার পথে ১০ জানুয়ারি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে (ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট) যাত্রা বিরতি করলেন তিনি। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ মন্ত্রীসভার সকল সদস্য ও শীর্ষ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের জাতির পিতাকে অবিস্মরণীয় অভ্যর্থনা জানালেন। একুশবার গান স্যালুটের মধ্য দিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অভিবাদন জানানো হল, ওড়ানো হলো বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় পতাকা। বাজানো হল দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত।

কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ঢাকায় পৌঁছলেন জাতির জনক। পাকিস্তানের কারাগারে থেকেও যিঁনি রাষ্ট্রপ্রতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সেই প্রাণপ্রিয় নেতাকে মুক্ত স্বদেশে স্বাগত জানালো লাখো মানুষ। সব রকমের নিরাপত্তা বেষ্টনি উপেক্ষা করে হাজারো মানুষ ঢুকে পড়ল বিমানবন্দরে। রয়াল এয়ার ফোর্সের বিমানটি তেজগাঁ বিমানবন্দরে অবতরণের পর ঘিরে রাখলো উদ্বেলিত জনতা, যা দেখবার সৌভাগ্য হল আমার।

ঢাকার মাটিতে অবতরণ করার আগে বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ ধরে বিমানের জানালা দিয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় 'সোনার বাংলা' দেখলেন, যাকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গোটা মুজিবনগর মন্ত্রীসভা, মুক্তিযুদ্ধের বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্ব, শীর্ষ ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ লাখো মানুষ বঙ্গবন্ধুকে আবেগময় অভ্যর্থনা জানালেন। সদ্য-স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনী স্যালুট জানালো জাতির পিতাকে। পেরোতে থাকলো আবেগময় এক মহামূহুর্ত। এরপর ধীর গতিতে এগিয়ে চললো মোটর শোভাযাত্রা। সড়কের দুইপাশে হাজারো উদ্বেলিত মানুষ, সবাই এক নজর দেখতে চায় বঙ্গবন্ধুকে অসীম আবেগ ও ভালোবাসায়। এরপর তিনি পৌঁছলেন রমনা রেস কোর্সে ।

এ সেই ইতিহাসের রমনা রেস কোর্স, যেখানে অসামান্য এক ভাষণ রাখেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ, যা গোটা জাতিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১০ জানুয়ারির ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন,"আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা।" আরও বললেন, "ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই বলেছি, ক্ষমা চাই না। তাদের বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।"

সেদিনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বললেন, "বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটিশ, জার্মান, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।"

সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে জানি, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধবিদ্ধস্থ দেশের নেতৃত্ব গ্রহণের ঘটনাটি ছিল জাতীয় ইতিহাসের অসীম আশীর্বাদ। তাঁর ফিরে আসায় মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ সংকট দূর হয়, মুক্তি বাহিনীর অস্ত্র সংবরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন হয়, যা ছিল যুদ্ধ পরবর্তিকালের বড় চ্যালেঞ্জ । তাঁরই আহ্বানে মাত্র দুই মাসের মাথায় ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নতুন যাত্রাপথ নির্মিত হয়। একের পর এক সুচিন্তিত পদক্ষেপে তিনি নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্মাণে স্বচেষ্ট হন। তাঁরই নেতৃত্বে চীনসহ কিছু রাষ্ট্রের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের সদস্যপ্রাপ্তী ঘটে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং বিশ্ব ইসলামি জোটের সদস্য হয় বাংলাদেশ।

কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা বসে থাকেনি। যুদ্ধ বিদ্ধস্থ দেশে পরিকল্পিতভাবে আইনশৃংখলার অবনতি ঘটানো হয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করা হয়। বলা যায়, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকেই স্বাধীনতার শত্রুরা নতুন রাষ্ট্র ও তার জনককে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে ।■

● লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রণাঙ্গনের সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বেঁচে আছি এটাই সৌভাগ্য

ম. হামিদ

সাক্ষাৎকার : ফেরদৌস সালাম ● বিদ্যুত খোশনবীশ

ম. হামিদ। দেশের শীর্ষ পর্যায়ের এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব একাত্তরের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলেও শীর্ষ পর্যায়ের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই নাটক ও ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত।

বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ এর জন্ম ময়মনসিংহ শহর এলাকার গলগন্ডা কাজী বাড়ি। তার পিতা এম এ ওয়াদুদ এবং মা রাবেয়া খাতুন। পিতা ছিলেন পাকিস্তান সরকারের এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। পিতার বদলির চাকরির সুবাদে তিনি প্রায় ৮টি স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। পরে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯৬৫ সালে ম্যাট্রিক, আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ৬৭তে ইন্টারমিডিয়েট এবং জগন্নাথ কলেজ থেকে ৬৯ এ স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। তিনি তখন মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। '৬৯ এর গণআন্দোলনে তিনি ঢাকা ও জামালপুরে অংশ নেন। মাস্টার্স এর ছাত্র থাকাকালীন আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। '৭১ সালে তিনি ময়মনসিংহ ইপিআর ক্যাম্পে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করার এক মহানায়ক। তিনি সেখানকার ইপিআর এর বাঙালি সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন। ৩ এপ্রিল '৭১ হানাদার বাহিনীর হাতে টাঙ্গাইলের পতন হলে তিনি তার সহকর্মী ও ইপিআর সদস্যদের নিয়ে মধুপুর জঙ্গলের জলছত্রে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

সেনা সদস্য না হলেও ম. হামিদ কলেজ জীবনে ইউটিসির সদস্য হিসেবে পাক সামরিক ট্রেনিং নেয়ায় যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। শত্রু পক্ষকে ধোঁকা দেয়ার বুদ্ধিমত্তাও ছিল তাঁর। এ জন্যেই তাঁর পক্ষে স্বল্প সংখ্যক সহকর্মী নিয়ে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত ময়মনসিংহকে হানাদারমুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক, দেশখ্যাত নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা ম. হামিদ মুক্তিযুদ্ধ ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিয়ে প্রত্যয়কে যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি দেশখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আপনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন– সংক্ষেপে জানতে চাচ্ছি–

ম. হামিদ : কলেজে পড়ার সময়েই আমি তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। স্বৈরাচারী আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেই। ১৯৭০ এর ৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। এটি তখন স্পষ্ট যে '৭১ এর ৩ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারও গঠন করবে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের এই অপ্রত্যাশিত ভাষণের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে সাধারণ মানুষ গর্জে ওঠে– বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। মিছিলে সকলের হাতে লাঠি, নয়তো বাঁশ, না হয় ইটের টুকরো। মিছিলে মিছিলে এক অগ্নিগর্ভ নগরীতে পরিণত হলো ঢাকা। শুধু ঢাকাই নয়, সারাদেশের প্রতিটি জেলা, মহকুমা ও থানাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাটে-বাজারে। ঢাকা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের সাথে পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা চলছিল। উত্তেজিত জনতা স্টেডিয়ামের প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে দিলো। গ্যালারিতেও স্লোগান উঠলো, বন্ধ হয়ে গেলো খেলা।

হোটেল পূর্বাণীতে সংবিধান রচনার কাজ করছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বেরিয়ে এসে ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বললেন, অচিরেই তিনি জনসভায় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। কারফিউ জারি করলো সরকার। অন্ধকার আর কারফিউ এর মাঝেও শোনা গেলো স্লোগান আর গুলির শব্দ। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের গাড়ি বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকসু ভিপি আ স ম আব্দুর রব, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণের একটি মুহূর্তে সবুজের মাঝে একটা লালবৃত্ত, তাতে হলুদ রঙয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা পতাকাটি হেলিয়ে দুলিয়ে ওড়ালেন। স্বাধীন দেশের পতাকা উড্ডীন হলো বাংলার আকাশে। ছাত্র-জনতার মাঝে তখন ভীষণ উচ্ছ্বাস। ৩ মার্চ ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে এই পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করলো। দাবি একটাই- স্বাধীনতা।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ লোকের সমাবেশে এদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিলেন– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। খুব কাছ থেকে দাঁড়িয়ে এই ভাষণ শুনে আমার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে যাবার তীব্র বোধ কাজ করে। ঠিক করলাম দ্রুত ময়মনসিংহে চলে যাবো। তখন কামরুল আলম খান খসরু ও মোস্তফা মহসীন মন্টু ছিলেন ছাত্রলীগের

ডাকসাইটে নেতা। খসরু ভাইকে বললাম, আমি ময়মনসিংহে যাবো ইপিআর ক্যাম্প দখল করতে। আমার অন্তত পাঁচটা অস্ত্র লাগবে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, লোক মারফত চিঠি দিলে ব্যবস্থা করে দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। দেশ চলছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। মহসীন হলের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে ১৩ মার্চ ময়মনসিংহ চলে আসি নিজেদের বাড়ি গলগন্ডা কাজী বাড়ি। পরদিন সকালে ইপিআর ক্যাম্পের পাশের খাগডহর বাজারে আসি। পুরনো বন্ধুদের বললাম, এখানকার বাঙালি ইপিআরদের সাথে তাদের যোগাযোগ কেমন, সম্পর্ক কেমন। বাজার থেকে বন্ধু খাজা মইনুদ্দিনের বাড়িতে এলাম তোতাসহ। ঢাকার নির্দেশে তখন দেশের সর্বত্রই তরুণ যুবকরা লাঠি ও কোথাও কোথাও ডামি রাইফেল নিয়ে প্যারেড ও ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি এ ধরনের ট্রেনিংয়ের কথা বলতেই ও সানন্দে রাজি হয়ে গেল। দুদিনের মধ্যেই আঠারো-কুড়ি জন যুবককে নিয়ে লাঠি হাতে প্যারেড ও ট্রেনিং শুরু করলাম। একদিন ইপিআর ক্যাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে প্যারেড করে এলাম। ওরা ভেতর থেকে কৌতুহলী হয়ে দেখলো। ইপিআর ক্যাম্পের অধিনায়ক ছিলেন উইং কমান্ডার ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস, পাঞ্জাবের লোক। একজন লেফটেনেন্ট, সেও পশ্চিম পাকিস্তানের। সুবেদার মেজর একজন পাঠান। অবাঙালি সৈন্য ১০০ জন। বাঙালি ৩০০ জনের মতো। কয়েকজন জেসিও আছেন বাঙালি। বাঙালিদের অনেকেই তখন আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। আমি আশাবাদী হলাম, ইপিআর এর বাঙালি সেনারা আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে থাকবে।

প্রত্যয় : এই যে আপনি ময়মনসিংহ ইপিআর ক্যাম্প দখলের কথা ভাবলেন, এই চিন্তা কিভাবে মাথায় এলো?

ম. হামিদ : ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে সরিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসলেন। সে মুহূর্তে রাজনৈতিক কারণে আমার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি হলে আমি চলে যাই। সেখানে জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক অজিত গুহের সুপারি বাগানের বাড়িতে পুর্নেন্দু দস্তিদারের স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম বইটি পড়ার সুযোগ পাই। এতে মাস্টারদা সূর্য সেন এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী পড়ে মনে হয়েছিল আমার জীবনে যদি এমন একটি সাহসী ঘটনা ঘটানোর সুযোগ পেতাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে মনে হলো, আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে এবং আমি ময়মনসিংহ ইপিআর ক্যাম্প দখল করবো। আমার মূল পরিকল্পনা ছিল যদি ডাক আসে, তবে বাঙালি ইপিআর সদস্যদের নিয়ে ক্যাম্পের ভেতরে অভ্যুত্থান ঘটাবো এবং অস্ত্রশস্ত্র দখলে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করবো।

প্রত্যয় : এর মধ্যে ইপিআর ক্যাম্পের বিষয়ে কোনো অগ্রগতি পেলেন?

ম. হামিদ : এর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। একদিন খাগডহরের কাঁচা বাজারের বিক্রেতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইপিআর এর পাকিস্তানি সেনাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য শাকসব্জি বিক্রি বন্ধ করে দেয়। ক্যাম্পের উইং কমান্ডার আওয়ামী লীগের জেলা নেতৃবৃন্দের কাছে নালিশ জানালেন। ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকউদ্দিন ভূইয়া ও এমএনএ এডভোকেট সৈয়দ আবদুস সুলতান এলেন খাগডহর বাজারে। আমাদেরকে ডেকে বললেন মনে হচ্ছে ঢাকায় আলোচনা সফল হতে যাচ্ছে, এ সময় কোনো গোলমাল না হওয়াই ভালো। আমাদের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে উইং কমান্ডার কমর আব্বাসের সাথে আলাপ করিয়ে আপোষ করে দিলেন।

প্রত্যয় : ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় যে গণহত্যা হয় তা আপনি কখন জানতে পারলেন? কি উদ্যোগ নিলেন?

ম. হামিদ : সে রাতের ঘটনা রাতে কিছুই জানতে পারিনি। ২৬ মার্চ ভোরে আব্বা মসজিদে নামাজ শেষে কাঠগোলার মোড়ের বাজার থেকে দ্রুত বাড়িতে ফিরে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন– 'হামিদ তুই এখনও ঘুমিয়ে আছিস? ওদিকে ঢাকায় পাকিস্তানিরা ছাত্র, পুলিশ, ইপিআরদের সব মেরে ফেললো, আর তুই ঘুমাচ্ছিস!' আমি পোশাক পাল্টে সাইকেল নিয়ে সোজা চলে এলাম ইপিআর ক্যাম্প এলাকায়। ক্যাম্পের দুই দিকে মূল সড়কের পাশের গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে ব্যারিকেড তৈরির কাজ শুরু করে দেয়া হলো। ইপিআর ক্যাম্পের ভেতর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি ছিল যার

অধিনায়ক ছিলেন মেজর নুরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের জোনাল মার্শাল 'ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। থাকতেন ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে পিডবি-উডি'র একটা বাংলোয়। সকালে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। জানলাম তিনি ঘুমাচ্ছেন। চলে গেলাম মুক্তাগাছার দিকে মনতলা ব্রিজে। ব্রিজের ওপারে করাতিদের সাহায্যে একটা বড় কড়ই গাছ কেটে রাস্তার ওপর ফেলা হলো, যাতে হানাদাররা এদিকে ডুকতে না পারে। ফিরে আবার ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখি মেজর নুরুল ইসলাম ও লেফটেনেন্ট মান্নান ইপিআর ক্যাম্পে চলে গেছেন।

আমি আবার খাগডহর বাজারে ফিরে আসি। লোক সমাগম বাড়ছে। ভাবছি কিছু একটা করা দরকার। একজন বললো সবখানেই বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ইপিআর ক্যাম্পেও বাংলাদেশের পতাকা উড়াতে হবে। একটা দোকান থেকে বাঁশসহ পতাকা খুলে নিয়ে রওনা দিলাম ক্যাম্পের দিকে। সাথে কুড়ি-পঁচিশ জন ছাত্র-যুবক। আমি সবার আগে। প্রায় ১০০ গজ পথ পাড়ি দিয়ে এলাম ইপিআর ক্যাম্পের গেটে। পেছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। আমার সাথে একজন মাত্র কিশোর– পরে জেনেছি নাম মজনু। স্কুলে পড়তো। আমার মধ্যে প্রচন্ড জেদ কাজ করলো। ভেতরে ঢুকবোই। দু'জন প্রহরী ছিল, বললাম– গেট খোলো। জানালো পারমিশন লাগবে। বললাম– যাও পারমিশন নিয়ে আসো। একজন অনুমতি আনতে গেলো। ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস আমাকে চিনতেন। গেট খুলে দিলে দু'জন একত্রে ঢুকছি দেখে বললো– একজনের পারমিশন আছে। আমি বললাম, দু'জনেই ঢুকবো। পতাকা হাতে নিয়ে এগুচ্ছি দেখে বলা হলো– বাইরে রেখে আসতে হবে। আমি বললাম- না, নিয়েই ঢুকবো।

প্রত্যয় : আপনাকে বেশ সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে–তারপর?

ম. হামিদ : ঠিকই বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদেরকে সত্যিই অসীম সাহসী করে তুলেছিল। এরপর আমরা দু'জন পতাকা স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি। অস্ত্রসহ সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। ছাদে বসানো এসএমজি চোখে পড়লো, সব কিছুই তাক করা। পাকিস্তানের পতাকা স্ট্যান্ডের সামনে একজন সেন্ট্রি অস্ত্রসহ। সোজা তার কাছে গিয়ে বললাম– ঐ পতাকা নামাও, এই পতাকা তোলো। সে চুপচাপ। এবার আমি একটু উচ্চস্বরে বললাম, কি হলো ঐ পতাকা নামাও। এমন সময় শুনতে পেলাম পেছন থেকে কেউ ডাকছে– মিস্টার হামিদ, প্লিজ কাম ইন। তাকিয়ে দেখি বারান্দায় ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস। পাশে মেজর নুরুল ইসলাম, লে. মান্নান এবং কয়েকজন জেসিও। আমি বললাম, আগে এই পতাকা উড়াবো, তারপর ভেতরে আসবো। মেজর নুরুল ইসলাম বললেন, ভেতরে আসুন কথা বলি তারপর ঠিক করব কি করা যায়। হাতের পতাকা ছেলেটির হাতে দিয়ে বললাম, এটা কারো হাতে দিবি না। অফিসারদের বললাম, এই পতাকায় যাতে কেউ হাত না দেয়। ওরা নিশ্চিত করলো কেউ হাত দেবে না। তাদের সাথে অফিস ঘরে ঢুকলাম। আমার সামনে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস, পাশে পাঞ্জাবী এক লেফটেনেন্ট, টেবিলের অন্য পাশে মেজর নুরুল ইসলাম, লে. মান্নান। ঘরের তিন কোনায় পাকিস্তানি ৩ সৈনিকের হাতে এলএমজি।

তাদের কথা– এটি সামরিক এলাকা। আমি যেনো পতাকা নিয়ে ফেরত যাই। মেজর নুরুল ইসলামও তাই বললেন। আমি কৌশল করে বললাম, পাকিস্তানের পতাকা নামাতে হবে এই শর্তে আমি পতাকা নিয়ে ফেরত যাবো। ক্যাপ্টেন কমর উত্তেজিত হয়ে বললেন, হাউ ক্যান উই ব্রিং ডাউন পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ? আমি বললাম– পাকিস্তান ডাজ নট একজিস্ট এনি মোর। মেজর নুরুল ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন, ইপিআর এর পতাকা?

বললাম, ওটা থাকতে পারে। আমার মনে হলো একটা নৈতিক জয় পেলাম। বের হয়ে আসার সময় মেজর নুরুল ইসলাম বললেন- হামিদ সাহেব দেখবেন, যেন কোনো গোলমাল না হয়। আমি যখন বাইরে এলাম দেখি পাকিস্তানের পতাকা সেই স্ট্যান্ডে নেই। কেবল ইপিআর এর পতাকাটি উড়ছে। আমার মুখে তখন বিজয়ীর হাসি।

প্রত্যয় : ইপিআর ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কি করলেন?

ম. হামিদ : খাগড়হরের উপস্থিত মানুষজন আমাকে হাসিমুখে যেতে দেখে বুঝতে পারলো কিছু একটা করতে পেরেছি। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে বললেন, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় সেনাবাহিনী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ভাষণ শেষ হতেই আমি একটি ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলাম, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, আমাদের লড়তে হবে।'

ভারতের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জে ওসমানী

বক্তৃতা করে নামতেই খাজা মইনুদ্দিন আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললো– এটি ওয়্যারলেসে এসেছে। কাগজে ইংরেজিতে লেখা বঙ্গবন্ধুর বার্তা। বার্তাটি ছিল এরকম– 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করছে। তারা নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। আমাদের ন্যায্য দাবি তারা মানলো না। দেশকে মুক্ত করতে আমাদেরকে লড়াই করে যেতে হবে। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মানুষের প্রতি আহ্বান জানাই আমাদের পাশে দাঁড়াতে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা। নিচে লেখা শেখ মুজিবুর রহমান।

এ সময় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ চূড়ান্ত আকার ধারণ করলো। সবাই বলছে, হুকুম দিন। ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করবো। আমি বারণ করলাম। কারণ, দেশি অস্ত্র দিয়ে রাইফেল মেশিনগানের সামনে যুদ্ধ করা যাবে না, অনেক লোক ক্ষয় হবে।

এ পর্যায়ে আমি খাজা, তোতা এবং স্কুল শিক্ষক নজরুল ইসরাম পরিকল্পনা করলাম বাঙালি ইপিআরদের অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। তারা দ্রুত অস্ত্রাগার দখল করে সেই অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দেবে। তবে ইপিআর এ প্রস্তাবে রাজি হলো না। তারা বললো– জনগণ ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করলে তারা সাথে অংশ নেবে। কিন্তু আমি এতে রাজি না। ইতোমধ্যে ঢাকার গণহত্যা, পুলিশ ও ইপিআর হত্যাযজ্ঞের কথা সবাই জেনে গেছে। খাগড়হরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। সবাই দেশি অস্ত্রে সজ্জিত। প্রায় তিন হাজার লোক জমায়েত হয়েছে। কি করবো যখন ভাবছি, তখন এয়ারফোর্সের কর্পোরাল এমদাদ একটা পরামর্শ দিল। তিনি বললেন, আপনি এদের মধ্যে থেকে দু'তিনটা দল গঠন করুন। দলনেতা নির্বাচন করুন এবং তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করুন। এভাবেই আমরা পরবর্তী কার্যক্রমের প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। শহর থেকে ৪/৫টি বন্দুক নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। পরে ভেটেরনারি ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালের বন্দুক নিয়ে এসে ঠিক সাতটায় পরিকল্পনা অনুযায়ী পরপর দুটি ফাঁকা গুলি ছুড়লাম। কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর দিয়ে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধার দল ঢুকে পড়ল। হঠাৎ আকাশে ফায়ার হলো। শূন্যে আগুনের আলো জ্বলতে দেখে ভয়ে অনেকেই পিছিয়ে আসে।

এ সময় মেজর নুরুল ইসলাম এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি বাঙালি মেজর, এখানে যা করার করব।' এই বলে তিনি যারা ভেতরে ঢুকেছিল তাদেরকে ফেরত পাঠান। ওদিকে ইপিআর যাদেরকে মোতায়েন করেছিল আক্রমণ ঠেকাতে তাদেরকে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস গুলি চালানোর হুকুম দিলেও তারা গুলি চালায়নি। এভাবেই ২৬ মার্চ আমাদের অভিযান শেষ হয়।

প্রত্যয় : আপনারা এ বিষয়গুলো কি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছিলেন?

ম. হামিদ : আমরা তখনকার জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট সৈয়দ আবদুস সুলতান এবং জেলা আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভূইয়ার সাথে কথা বলি। সে সময় দেখি ভূইয়া সাহেবের বাসার সামনে ৫০/৬০ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ও সৈন্য একত্রিত হয়ে তাদের কাছে অস্ত্র চাইছেন– তারা ঢাকা যাবেন যুদ্ধ করতে। আমাকে নিয়ে এই দুই নেতা ইপিআর ক্যাম্পে আসেন মেজর নুরুল ইসলামের সাথে কথা বলতে কিন্তু তিনি আগ্রহ দেখাননি। পরবর্তীতে ২৭ মার্চ রাতে বাইরে থেকে জনগণ এবং ভেতর থেকে বাঙালি ইপিআরদের আক্রমণে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসসহ অবাঙালি সৈন্যরা নিহত হয় এবং ইপিআর ক্যাম্পে বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যয় : জনাব হামিদ, ২৬ মার্চ আপনি ইপিআর ক্যাম্পে বাংলাদেশের পতাকা উড়াতে পারেননি, আপনার সেই ইচ্ছা কখন পূরণ হলো?

ম. হামিদ : আমি সেদিন বাংলাদেশের পতাকা উড়াতে না পারলেও পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে এসেছিলাম। সেই স্ট্যান্ডেই ২৮ মার্চ সকালে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হলো এবং এই বিজয় আমাদের মধ্যে ব্যাপক সাহস ও পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রত্যয় : মেজর কে এম সফিউল্লাহ তার ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাহিনী নিয়ে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহ আসেন। তিনি আপনাদের সংগঠিত করার কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কি?

ম. হামিদ : তিনি ২৮ মার্চ বিকেল ৩টায় ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে আসেন। তিনি আসায় আমরা বেশ আশান্বিত হই। তিনি মেজর নুরুল ইসলামের কোম্পানি এবং ইপিআর বাহিনীর সার্বিক কমান্ড নিলেন। ৩০ মার্চ ট্রেনে এদের সকলকে নিয়ে অস্ত্র আনতে চলে গেলেন ভৈরবের দিকে, ময়মনসিংহে সৈন্য বাহিনীর আর কোনো সদস্যই রইল না। আমরা একদম অরক্ষিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমরা দমে যাইনি।

প্রত্যয় : ৩ এপ্রিল '৭১ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইল দখল করে নেয়ার পর আপনারা কি ধরনের প্রস্তুতি নিলেন?

ম. হামিদ : আমি আগেই বলেছি, ময়মনসিংহ রক্ষার জন্য আমরা ইপিআর এর বাঙালি সৈনিকদের আশ্রয় ভেবেছিলাম। কারণ, তাদের ট্রেনিং আছে। ভেবেছিলাম, ইপিআর এবং মেজর নুরুল ইসলামের ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মেজর সফিউল্লাহ আসার পর আমাদের মধ্যে আরো সাহস সঞ্চিত হয়। কিন্তু ৩০ মার্চ তারা শহর ছেড়ে চলে যাবার পর আমরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়ি। বুঝতে পারলাম, আমাদের নিজেদেরই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে গেরিলা কায়দায়। আমি ময়মনসিংহ থেকে যাওয়া কয়েকজন ইপিআর সদস্যদের নিকট কয়েকটি অস্ত্র পেলাম। ঠিক করলাম, মধুপুরে আমরা অবস্থান নেবো এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হক এমপিএ সাহেবকে আমার পরিকল্পনার কথা জানালে তিনি আমাকে নিয়ে বের হলেন। বিভিন্ন নির্বাচনী ক্যাম্পে তখন ছাত্র যুবকরা আড্ডা দিতো। সেসব ক্যাম্পে গিয়ে তাদের বললাম যুদ্ধে যেতে। শামসুল হক সাহেব বললেন, পাকিস্তানি বাহিনী যখন আসবে তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে ৫টা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে দিলেই আর আসতে পারবে না। ২ দিন চেষ্টা করে মাত্র ৯ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ৯টি রাইফেল, কয়েকটি গ্রেনেড আর কিছু গুলি নিয়ে ৫ এপ্রিল মধুপুরের জলছত্র স্থানীয় মিশনারিতে প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করি। এদের দলনেতা করা হলো এসএসসি পাস ১৮ বছরের নুরুল ইসলামকে।

আমি ময়মনসিংহ থেকে প্রতিদিনই মধুপুর পর্যন্ত এসে তাদের ট্রেনিং পর্যবেক্ষণ করতাম। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের নতুন পর্ব। সীমান্ত এলাকা থেকে ইপিআরদের কিছু সদস্য, পুলিশের কিছু সদস্য এসে যোগ দিতে থাকল। এই দলটি প্রায় প্রতিদিনই অস্ত্রসহ লেফট রাইট করতে করতে ঢাকার রাস্তা ধরে মধুপুর পর্যন্ত যেতো– যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে মুক্তিবাহিনীর একটি দল আছে। এ ছাড়া আমার আরেকটা চিন্ত কাজ করেছে যে, পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে যেন খবর যায় যে, মধুপুর গজারি বনের মধ্যে মুক্তিবাহিনী আছে।

প্রত্যয় : মধুপুরে কখন প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সুযোগ পেলেন?

ম. হামিদ : আমাদের মুক্তিবাহিনীর কুচকাওয়াজ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাহসের জন্ম দিল। এর মধ্যে জানতে পারলাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মধুপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। সেটি ছিল ১৪ এপ্রিল। আমরা দুটি গ্রুপে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্যোগ নিলাম। তারা যখন মধুপুর ব্রিজ পার হয়ে উত্তরে এলো তখন দু'দিক থেকে গেরিলা আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারা ভাবতে পারেনি এমন একটি আক্রমণের শিকার হবে। এই যুদ্ধে তাদের দুটি গাড়ি ও অনেক গোলাবারুদ আমরা দখল করে নেই। ইপিআর এর দু'তিনজনসহ মূলত স্বল্প ট্রেনিংয়ের ছাত্ররাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শত্রুরা নিহত ও আহত সৈনিকদের নিয়ে টাঙ্গাইলের দিকে পালিয়ে যায়। এটি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রথম বিজয়– এই বিজয় আমাদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই বিজয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ইপিআর সদস্য আমাদের সাথে যোগদান করে, সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫০-এ দাঁড়ায়। আমরা ১৯ এপ্রিল কালিহাতীর প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেই। কিন্তু পাকবাহিনীর ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও আমাদের প্রস্তুতির অভাবে পিছু হটতে বাধ্য হই। এ থেকে শিক্ষা লাভ হয় যে, যুদ্ধ মোকাবেলায় শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন অনেকখানি।

প্রত্যয় : পাকবাহিনী কবে ময়মনসিংহ দখল করে নেয় এবং আপনারা তখন কি করলেন?

ম. হামিদ : ২৩ এপ্রিল পাকবাহিনী ঢাকা থেকে রেললাইন ধরে এসে ময়মনসিংহ প্রবেশ করে। তারা ব্যাপক গোলাবর্ষণ, শেলিং করে ভয়ানক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। আমি এবং ড. মাহমুদ (পরে বীর প্রতীক) একসঙ্গে ছিলাম। ওর কাছে রিভলবার, আমার কাছে ছিল এসএলআর। দু'জনে নিরাপদে যাওয়ার জন্যে দৌড়াতে থাকি। আমি স্পোর্টসম্যান, দৌড়াতে অসুবিধা হয়নি, মাহমুদ ছিল মোটা, খুব কষ্ট হচ্ছিল। এভাবেই আমরা ৫ মাইল দূরে ফুলবাড়িয়ার শিবগঞ্জ বাজারে পৌঁছি। এখান থেকে ৯ দিন হেঁটে ৪ মে ভারতের ঢালুর কাছে পৌঁছাই হালুয়াঘাট নালিতাবাড়ির মাঝ দিয়ে ধানিহাটা মিশনারি ক্যাম্প হয়ে। ওখানে গিয়ে বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা হাশেমকে পাই। ও জানালো আমাদের অস্ত্র বিএসএফ এর কাপ্টেন বানজিৎ সিং কেড়ে নিচ্ছে তাই সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছি না। আমরা বানজিৎ সিং এর সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্র ফিরিয়ে আনি। তবে দুটো চাইনিজ অস্ত্র সাব মেশিনগান ও এলএমজি দেয়নি– ওটা ওদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়।

প্রত্যয় : সীমান্তে পাকবাহিনীর কোনো আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন কি?

ম. হামিদ : ২৪ মে রাতে পাকবাহিনীর আক্রমণে মধুপুর মুক্তিবাহিনীর প্রথম কমান্ডার মতিন শহীদ হয়। সেখানেই তাকে কবর দেয়া হয়। পরে একবার পাক আর্মিরা নশুগাঁও এর উল্টোদিকে কিল্লাপাড়ায় ঘেরাও করে কয়েকশ শরণার্থীকে হত্যা করে। এর মধ্যে মধুপুর যুদ্ধে অংশ নেয়া এয়ারফোর্সের আশরাফুল মতিন এবং শেরপুরের এমপির ভাই মতিউর রহমানকেও হত্যা করে। এই দুজনকে আমরা তুরায় নিয়ে কবরস্থান খুঁজে কবর দেই। বাকীদের হয় গণকবর। পাকবাহিনীর নৃশংসতা হিটলারকেও হার মানায়।

প্রত্যয় : কবে আপনাদের সদস্যদের ট্রেনিং শুরু হলো, কবে দেশে ফিরেছেন?

ম. হামিদ : মে মাসের শেষ দিকে প্রস্তুতি এবং

জুনের প্রথম সপ্তাহে তুরা থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে ট্রেনিং শুরু হয়। প্রথমে ১ মাস, পরে ৩ সপ্তাহের ট্রেনিং দেয়া হতো। প্রতি কোম্পানিকে ১টি এসএলআর, ২টি এলএমজিসহ অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে ভেতরে পাঠানো হতো এবং তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হানা দিয়ে আবার এখানে এসে আশ্রয় নিতো। এসব ক্ষেত্রে বিএসএফ সহযোগিতা করতো। আমার ইউটিসি ট্রেনিং থাকায় ট্রেনিং নেয়ার প্রয়োজন হয়নি।

৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ থেকে পাক সেনারা চলে যায়। ১০ তারিখে যৌথ বাহিনী ময়মনসিংহ আসে। আমি আমার দল নিয়ে ১১ তারিখে নালিতাবাড়ি হয়ে ময়মনসিংহ আসি। এরপর ঢাকাকে মুক্ত করতে আমি আমার ট্রুপ নিয়ে সাভারের দিকে যাই। এখানে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয় এবং ১৯ জনকে অ্যারেস্ট করি। পরে

গাবতলী দিয়ে ঢাকার ভেতর ঢুকি।

প্রত্যয় : স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা যায় দেশে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম ব্যাপক আকার ধারণ করে যা এখনো বিদ্যমান– এর পেছনে মূল কারণ কি?

ম. হামিদ : মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ায় মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটেনি। যদিও দেশের কোটি কোটি মানুষ নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি ও সম্পদ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষের লুটপাট ও ঘুষ দুর্নীতির কারণে দেশের উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ থেকে উদ্ধার করতে না পারলে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

প্রত্যয় : টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ পাশাপাশি অঞ্চল। যুদ্ধকালে আপনার সাথে কি টাঙ্গাইলের কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর দেখা হয়েছিল?

ম. হামিদ : তিনবার দেখা হয়েছে। প্রথমবার মধুপুরে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে– উনি তার সঙ্গীদের নিয়ে জলছত্র এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। দিতে পারিনি। দ্বিতীয়বার জামালপুরে এবং সর্বশেষ উনি যখন আহত হয়ে তুরায় আসেন তখন। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এই ম. হামিদ একদিন আমাকে তার ক্যাম্পে আশ্রয় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল।

প্রত্যয় : আপনি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। গণমানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশে কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

ম. হামিদ : গণমানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও জনসম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম স্থিতিতে গণমানুষের কাছে যেতে হবে। গণমানুষকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা নয়। নাটকটা শহুরে সংস্কৃতি– এর বিকাশ শহরেই হবে। গণ নাটক, যাত্রা এগুলো গ্রামেই বেশি জনপ্রিয় ছিল। গণ সঙ্গীতও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গীত– খোলা মাঠেই হতে হয়। আমাদের সংস্কৃতি যদি গান-বাজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলি তাহলে একরকম, আর যদি টোটাল জীবন-যাপনকেই নির্মাণ করি– যেমন সততাও সংস্কৃতির একটি অংশ, সত্য কথা বলাও সংস্কৃতির অংশ এবং দুর্নীতিমুক্ত থাকাটাও সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য। মানুষের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো এবং এসব চর্চা করার বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট। মূল্যবোধ হচ্ছে ভালোমন্দের তফাৎ বোধ করা। সততা, নিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত থাকা, অন্যের উপকার করা ইত্যাদি সব মিলিয়েই একজন মানুষ সংস্কৃতিবান হয়। শুধু গান-বাজনাকেই সংস্কৃতি বলা যায় না। সমগ্র জীবনাচারের মধ্যে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ ঘটানোর মধ্যেই সংস্কৃতি বিদ্যমান। যে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জীবনাচারকে শুদ্ধতার দিকে এগিয়ে নেয়া যায় আমাদের সেই উদ্যোগ নিতে হবে। মানবিক মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটাতে হবে। কারণ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে, দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে এগিয়ে নিতে, দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার জন্য সংস্কৃতিবান শুদ্ধ মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের সংস্কৃতির মান বাড়াতে হবে। নিজস্ব উপাদানের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে আপনার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ম. হামিদ : স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী- এটা একটা দারুণ সৌভাগ্য। ৫০ বছর আগে যুদ্ধ করেছি, আর স্বাধীনতার ৫০ বছর পর সে দেশে বেঁচে আছি, হাসছি, ঘুরছি, কথা বলছি- এটা একটা দারুণ ব্যাপার। একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনে এটা একটা বড় প্রাপ্তি। সুবর্ণ জয়ন্তীতে বেঁচে থাকা, এ দেশের আলো-বাতাস, ফসলের মাঠ, মানুষের কোলাহলের মধ্যে যে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি এটা একটা বিরাট পাওয়া।

২৮ মার্চ ময়মনসিংহ মুক্ত হয়। আপনারা যখন সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তার ৩ দিন পরেই সেই দিন। এটা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বিজয়। সেই প্রথম বিজয়ের একজন সৈনিক আমি। সেই বিজয় প্রথম অর্জনের অনুঘটকদেরও আমি একজন। ১৯৭১ এর ২৮ মার্চ এবং ২০২১ এর ২০ মার্চ– ৫০ বছর পূর্ণ হলো। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এ বছর ২৮ মার্চ সেখানে সেই বিজয় উপলক্ষে স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হবে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয় উদযাপিত হবে। এটি আমার জন্য অনেক অনেক গর্বের। যতোদিন বাঁচবো, আমি গর্ব করে বলবো– এই আমার দেশ, এটি অর্জনের জন্য আমি যুদ্ধ করেছি, জয়ী হয়েছি। এ দেশ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে– মর্যাদা দিয়েছে, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়েছে। আমাকে উপলব্ধি করতে দিয়েছে যে আমি এদেশের একজন অংশীদার। এই গৌরব আমৃত্যু থাকবে। আমার বংশধররাও এটি ধারণ করবে।■

আমরা তোমাদের ভুলবো না

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম বাকু

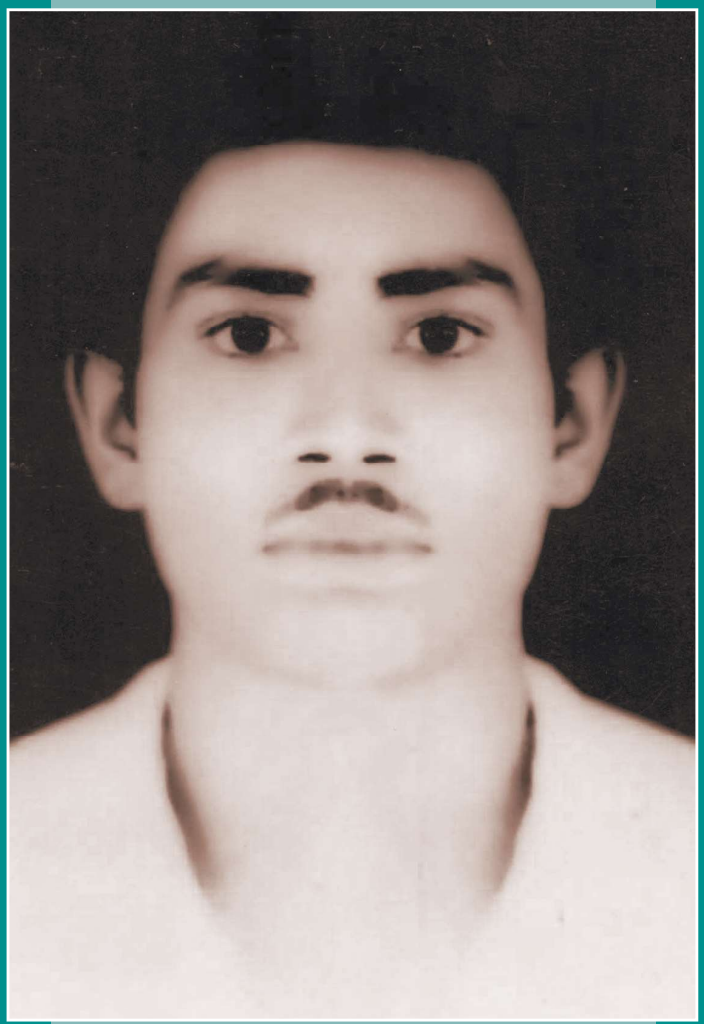

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দুঃসাহসী নজরুল ইসলাম বাকুর জন্ম টাঙ্গাইল শহরের কলেজপাড়ায়। তার পিতা মরহুম সিরাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী যাকে সবাই 'সিরাজ উকিল' নামেই চিনতেন। মায়ের নাম হালিমা খাতুন। ৬ ভাই ৪ বোনের মধ্যে বাকু ছিলেন ৯ম সন্তান।

ছোটবেলা থেকেই নজরুল ইসলাম বাকু ছিলেন দুঃসাহসী। বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়লেও লেখাপড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ ছিল না। বরং খেলাধুলা, দল বেঁধে ছুটোছুটি, কারো উপকার করা তার রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল। নিজেদের বাসার পাশে একটা ব্যায়ামাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে তিনি ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাকির হোসেনসহ (নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ) বন্ধুরা নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করতেন। রাজনৈতিকভাবে দল সংশ্লিষ্ট না হলেও একুশের প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। বাকুর মধ্যে নেতৃত্বের এক বিশাল গুণ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্ত থেকেই নজরুল ইসলাম বাকু এর সাথে সম্পৃক্ত হন। তাকে এবং আবুল কালাম আজাদকে (পরবর্তীতে বীর বিক্রম) দায়িত্ব দেয়া হয় টাঙ্গাইল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় গ্রেনেড ও বোমা হামলার। এই গ্রুপটির নাম দেয়া হয় জানবাজ পার্টি। তারা বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা চালিয়ে হানাদারদের ব্যতিব্যস্ত রাখেন।

তাদের দু'জনের উপর দায়িত্ব পড়ে টাঙ্গাইলের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ধ্বংস করার। সেই লক্ষ্য নিয়ে তারা দু'জন ১৬ আগস্ট রাতে শহরের পাশে ভাতকুড়ার নগরজল্লই গ্রামে মেইন রোডের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে এক্সপ্লোসিভ ফিট করে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেন। ওরা যখন হামলার উদ্যোগ নেন তখন ১৭ আগস্ট ভোররাত। কিন্তু রাতে বৃষ্টি থাকায় ট্রান্সফরমার পোলের গোড়ায় শাবল দিয়ে খোড়া গর্তে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় এক্সপ্লোসিভ সেট করা সম্ভব হয়নি। ফলে ধ্বংস করা যায়নি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারটি।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় তারা যখন নিরাপদে ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন তখন চারদিক থেকে রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের ঘিরে ফেলে। সম্মুখ যুদ্ধে পেরে না ওঠায় গুলি বর্ষণ করতে করতে পিছিয়ে যাওয়ার সময় বাকু রাজাকারদের গুলিতে মারাত্মক আহত হন। কালামও আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। এ সময় রাজাকার ইকবাল আহত বাকুকে কাছ থেকে আরো ১১টি গুলি করে। তাকে রাজাকারদের ট্রাকে উঠিয়ে পুরাতন জেলখানার পাশে মহকুমা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। তার মুখ থেকে তথ্য বের করার জন্যে গুলির ক্ষতের মধ্যেই বেয়নেট চার্জ করতে থাকে বর্বর রাজাকাররা। হাসপাতালে সাড়ে তিন ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শহীদ হন একাত্তরের অন্যতম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইলাম বাকু।

মুক্তিযুদ্ধের পরে শহীদ নজরুল ইসলাম বাকুর বন্ধু জাকির হোসেনসহ (বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক) অন্য বন্ধুদের উদ্যোগে আমঘাট রোডের নাম 'শহীদ নজরুল ইসলাম বাকু সড়ক' করে বিভিন্ন দোকানের সাইনবোর্ডে তা সন্নিবেশিত করা হয়। কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি না দেয়ায় এক সময় সেই নামকরণ মুছে ফেলা হয়। তবে জাকির হোসেন ও সা'দত কলেজের প্রাক্তন ভিপি আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে কলেজপাড়ায় শহীদ নজরুল ইসলাম বাকু ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আমার বন্ধু শহীদ বাকু

জাকির হোসেন

শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্য– জীবনের এই তিন অধ্যায় বন্ধুত্ব সৃজনের সোনালী সময়। যদিও শৈশবের বন্ধুরা হারিয়ে যায় কখনো কখনো। আর তারুণ্যের বন্ধুত্ব অবতীর্ণ থাকে টিকে থাকার দীর্ঘ পরীক্ষায়। কিন্তু কৈশোর! জীবনের এই অধ্যায়ের বন্ধুরা চিরকালই থেকে যায় মগজে-মননে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে কিংবা পৃথিবীর মায়া ছাড়িয়ে আরো দূরে কোথাও, যেখানেই থাকুক না কেন কৈশোরের বন্ধুরা থেকে যায় বন্ধু হয়েই। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমার সেই উঠতি বয়সের বন্ধুরা, যারা আজো বেঁচে আছে এবং যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তারা প্রত্যেকেই এখনো রয়ে গেছে আমার মানসপটে। দুঃসাহসী শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম বাকু তেমনই এক বন্ধু আমার।

বাকু ও আমার বাসা প্রায় কাছাকাছি, টাঙ্গাইল শহরের কলেজ পাড়ায়। ওর বাবা সিরাজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন আইনজীবী। মা হালিমা বেগম। বাবা'র কনিষ্ঠ ছেলে ছিলো বাকু। ছয় ভাই, চার বোন। বড় ভাই শফিউল আলম খসরু, তারপর মতিন আহমেদ, মজিবুর রহমান মজনু, আনোয়ার হোসেন ছুটু, আশানুর আলম ডেপু এবং বাকু। রিজিয়া খাতুন রেণু, রাশিদা খাতুন গুনু, সুরাইয়া বেগম ও রানু বেগম বাকুর বোন। রানু ছিলো বাকুর ছোট। ডেপু ও বাকু দু'জনেই আমার প্রায় সমবয়সী। বিন্দুবাসিনী বালক বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়ার আশানুর আলম ডেপু এবং খন্দকার আব্দুল আউয়াল রিজভী ছিলো আমার সহপাঠী। দেরিতে স্কুলে ভর্তি হওয়ায় বাকু পিছিয়ে ছিলো। বাকুদের বাসা কলেজ পাড়া মোড় সংলগ্ন। ও যে রুমটায় থাকতো সেটি ছিলো রাস্তার ধারে। বাকু আমার এতোটাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো যে ওকে ঘিরেই জমে উঠতো আমাদের প্রতিদিনকার আড্ডা ও খেলাধুলা। নদী-খাল-পুকুরে বর্ষায় ঝাঁপাঝাঁপি, মাছ ধরা, কিং কিং, গোল্লাছুট, মার্বেল, ডাংগুটি, এক্কাদোক্কা, কড়ি খেলা, লুকোচুরি ও কানামাছি খেলা ছিলো আমাদের নিত্যদিনের কাজ। এগুলো ষাটের দশকের কথা। এক সাথে পার্কে খেলতে যাওয়া, গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে খাওয়া, অন্যের গাছ থেকে নারিকেল ও আম চুরি করা এমনকি খোয়ার থেকে মুরগী ধরে এনে চড়ুইভাতি করতেও সিদ্ধহস্ত ছিলো আমাদের এই কিশোর দলটি। সন্তোষ জমিদার বাড়ির বাগান থেকে নানা ধরনের ফল পেড়ে আনাটা ছিলো আমাদের নিয়মিত অ্যাডভেঞ্চার। বাটুল আর মার্বেল দিয়ে পাখি শিকার করা তো ছিলো খুব সাধারণ ব্যাপার। স্বপন, বাবলু, জালাল, অমল, পরী, বরুণ, জীবন, গোবিন্দ, বাদল, মোঙ্গল পাল, গোপাল ও আমি সহ একদল কিশোর ছুটোছুটি করে বেড়াতাম পুরো শহর এবং আরো দূরের মাঠ-ঘাট-পথ। আমাদের হিন্দু বন্ধুদের কেউ কেউ পাঁচআনী বাজার ও আদালত পাড়া থেকে প্রতিদিনই কলেজ পাড়া চলে আসতো আড্ডা দিতে। বেতকা থেকে আসতো কামরুজ্জামান খান কামরুজ। আমিনুর রহমান, মনিরুজ্জামান সানু, পুনু, মিন্টু, গেদন– আড্ডার টানে ওরাও আসতো আকুরটাকুর পাড়া থেকে। থানা পাড়া থেকে রোকন, শাহরি, সাচ্চা, শফি, চন্দ্র বাদল– এরাও অনেকদিন সামিল হতো। সেই আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো বন্ধু বাকু। আড্ডা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, বন্ধুত্বকে গভীর করে। আমাদের বেলায়ও

তাই হয়েছিলো। খুব উচ্ছল ও দুরন্ত ছিলাম আমরা। কী চমৎকারভাবেই না কেটেছে দিনগুলো আমাদের! সেদিনের মতো খোলা মাঠ, মেঠো পথ, ফল ভরা গাছ আর মানুষের সারল্য নেই আর এখন। সেই সাথে বদলে গেছি আমরাও। বাকু নেই, নেই আরো অনেকে। যারা আছে তারাও নিজ নিজ জীবনে ব্যস্ততায় বন্দী।

এলাকায় আমাদের কিশোর দলটির বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। এমনকি বয়সে দু-তিন বছরের বড় ভাইয়েরাও আসতো আমাদের সাথে আড্ডা দিতে। পাঁচআনী বাজারের সুশান্ত কুমার রায়, যাকে আমরা কার্তিক দা বলে ডাকতাম– তিনি, আদালত পাড়ার কাশেম চৌধুরী, তালেবর, মহর রাজের ছেলে মালেক, দিঘুলিয়ার বকুল চাচা ও গিনিসহ অনেকেই আসতেন আমাদের সাথে আড্ডা দিতে। সে আড্ডায় এক ধরনের মোহ ছিলো। খুব স্বাভাবিকভাবেই, ছোটদের সাথে বড়রা আড্ডা দিলে এক ধরনের গর্ববোধ জেগে উঠে, আমরাও সেভাবেই চলতাম। তাছাড়া বাকুর জীবনে কার্তিক দা'র বিশেষ ভূমিকা ছিলো। বিন্দুবাসিনী বালক বিদ্যালয় থেকে বাকু'র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিলো ১৯৭২-এ। বাকুকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কার্তিক দা। আমাকে উৎসর্গ করে লেখা একটি কবিতাতেও তিনি বাকুর কথা লিখেছেন। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি:

তোমাকে দেখেছি আমঘাট রোডে
স্বচ্ছ সরল বন্ধু বেশে,
উৎফুল্ল হয়ে বাল্যসখাদের সাথে
খেলা-ধুলায় কত না রংবেরঙে। ...
এখনও কি মনে পড়ে
তোমার সাহসী বন্ধুটির কথা?
মুছে যায়নি স্মৃতি থেকে
হৃদয়ে বাজে বাকু'র কথা।

বাবা-মা'র শত শাসন ও বাধা সত্ত্বেও প্রতি বেলায় আমরা ছুটে যেতাম বাকুর ওখানে। আমরা প্রায় সমবয়সী হলেও বাকুর মধ্যে আলাদা একটা পরিমিতি বোধ ছিলো। সবকিছুর সীমারেখা ও খুব ভালো বুঝতো। একটা অদৃশ্য নেতৃত্বসুলভ ভাব ওর মধ্যে বিরাজ করতো। ছিলো প্রচন্ড সাহসী, অনেকটা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্রের মতো। অন্য পাড়ার ছেলেদের সাথে ঝগড়া বাঁধলে বাকুর কারণে আমরাই জয়ী হতাম। মূলত বাকুর কারণেই কলেজ পাড়ার একটা ইমেজ তৈরি হয়েছিলো যে, এ পাড়ার ছেলেদের সাথে লড়াই করা যাবে না, করলে হার নিশ্চিত। ফলে অন্য পাড়ার ছেলেরা আমাদের বেশ সমীহ করে চলতো।

এভাবেই অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেলো। সত্তরে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভর্তি হই করটিয়ার সা'দত কলেজে। এ সময় দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছিলো। এরই মধ্যে নভেম্বরে ভোলায় ইতিহাসের অন্যতম প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যু বরণ করে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে পাক সামরিক সরকারের অনিহা ও অদক্ষতায় চরম

শহীদ নজরুল ইসলাম বাকু
জন্ম: ৫ মার্চ ১৯৫৪ মৃত্যু: ১৭ আগস্ট ১৯৭১

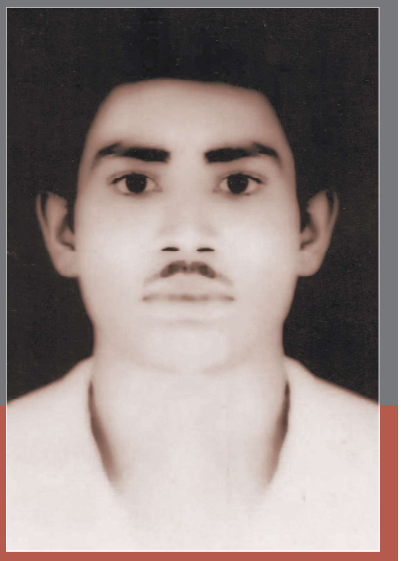

মূল্য দিতে হয় ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে। নাম মনে নেই, জলোচ্ছ্বাসের পর কোন এক চলচ্চিত্র শিল্পী পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেতা সৈয়দ কামালকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি চ্যারিটি শো করে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াবার। কিন্তু সৈয়দ কামাল মন্তব্য করেছিলেন, 'উন্সে হামে ক্যায়া?' অর্থাৎ 'তাতে আমাদের কী?' সৈয়দ কামালের এমন হটকারী মন্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে সময় টাঙ্গাইলের রূপবাণী সিনেমা হলে 'রোড টু সোয়াত' সিনেমাটি চলছিলো। আমরা বন্ধুরা সংগঠিত হয়ে ঐ সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ করে দেই। আমাদের তরুণ রক্তে তখন প্রতিবাদের আগুন। এর এক মাস পর অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগের ইতিহাসে সত্তরের এই নির্বাচন এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর যৌথ ষড়যন্ত্রে পাক-জান্তা সরকার বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে। ৭১ এর ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে এর প্রতিবাদে সারাদেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয় উঠে। এ ইতিহাস সবারই জানা, তাই আর লিখছি না। সারা দেশের মতো টাঙ্গাইলেও শুরু হয় জঙ্গী মিছিল, আমরাও সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি, বুকফাটা শ্লোগান দিয়েছি। আমাদের শ্লোগান ছিলো, 'পশ্চিমাদের পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধু যাবেন না, ছাতুখোরদের পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধু যাবেন না।'

এরপর একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাত্রি। পাক সেনাদের নৃশংসতম হত্যাকান্ডের পর হতবিহ্বল মানুষ দলে দলে পায়ে হেঁটে ঢাকা থেকে ফিরছে। আমরাও বুঝে গেছি, বাটুল ও মার্বেলের দিন ফুরিয়ে গেছে, সময় এসেছে এর চেয়েও বড় কিছু হাতে নেবার। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন এমপিএ ফজলুর রহমান খান ফারুক। পরে সেটি মাইকে টাঙ্গাইল শহরে প্রচার করেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি আনোয়ার-উল আলম শহীদ ও ছাত্রলীগ নেতা ফারুক আহমদ। ২৬ মার্চ টাঙ্গাইল থানায় উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা এবং একই সাথে চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। তার দিন কয়েকের মধ্যেই তৎকালীন এমপিএ বদিউজ্জামান খান, বাসেদ সিদ্দিকী ও সেতাব আলী খানের নেতৃত্বে গঠিত হয় হাই কমান্ড। এই হাই কমান্ডের কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এমপিএ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। পূর্ব আদালত পাড়ার এডভোকেট নূরুল ইসলামের বাসায় বৈঠকটি হয়েছিলো। লতিফ সিদ্দিকীর উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে অস্ত্র ও স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে এসিড সংগ্রহ করে তা দিয়ে হাত বোমা ও ককটেল তৈরি করা হতো। যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে লতিফ সিদ্দিকীর অন্যতম সহযোগী ছিলেন শ্রমিক নেতা হবিবুর রহমান খান, আবু মো. এনায়েত করিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও কবি আল মুজাহিদী, সৈয়দ আবদুল মতিন, বুলবুল খান মাহবুব, শাহ আহমেদ রেজা, হামিদুল হক মোহন, আতিকুর রহমান সালু, হাজেরা সুলতানা, আবদুর রহমান রব্বু, আলমগীর খান মেনু, শ্যামল হোড়, গোলাম সরোয়ার ছানা, খন্দকার নাজিম উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম সোনাসহ আরো অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এপ্রিলের ৩ তারিখে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এ খবর আগাম জানতে পেরে এমপিএ ফজলুর রহমান খান ফারুক ভাইয়ের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা ও ইপিআর সদস্যরা সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাক সেনারা গোড়ান সাটিয়াচড়া আসার পর প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে পড়লেও ভারী অস্ত্রের কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সাটিয়াচড়ার যুদ্ধে ৩৩৭ জন শাহাদৎ বরণ করেন। হানাদার বাহিনীর আগমনের খবর ইতোমধ্যে টাঙ্গাইল শহরে ছড়িয়ে পড়লে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ট্রেজারি থেকে পুলিশের রাইফেল ও গোলাবারুদ ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় সখীপুরে। ওখান থেকে আমরাও একটি রাইফেল পেয়েছিলাম। সে সময় বাকুও আমাদের সাথে ছিলো। ওই রাইফেল নিয়ে আমরা এলাকা পাহারা দিতাম।

টাঙ্গাইলে পাক সেনারা প্রবেশ করার পর পরিবারসহ আমরা অনেকেই কিছুদিনের জন্য গ্রামে চলে যাই। এ সময় মজনু মিয়া নামক এক তরুণ পুরান ঢাকা থেকে প্রায়ই বাকুদের বাড়িতে আসতো। মজনু মিয়ার প্রকৃত পরিচয় আমি জানতে পারিনি। কিন্তু তার এই যাতায়াতের খবর কালে খাঁ নামক এক পাক হাবিলদার জেনে যায়। এক রাতে দলবল নিয়ে কালে খাঁ মজনু মিয়া ও বাকুকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে রাখলেও হাজতে না রেখে বারান্দায় বসিয়ে রাখা হয়েছিলো ওদের। মজনু মিয়া ছিলো চিকন গড়নের। ফলে খুব সহজেই হ্যান্ডকাফ খুলে বাকুকে নিয়ে ভোর রাতে পালিয়ে যেতে সক্ষম

হয় সে। মজনু মিয়া কোথায় গিয়েছিলো জানা নেই, তবে বাকু ঐ রাতে আশ্রয় নেয় মিয়া বাড়ির আফজাল চৌধুরীর বাড়ির পেছনের পাট ক্ষেতে। ঐ বাড়ির কাশেম চৌধুরী হ্যাকসো ব্লেড এনে বাকুর হ্যান্ডকাপ কেটে দেয়। মুক্ত হয়েই বাকু ভূয়াপুর চলে এসে যোগ দেয় পশ্চিমাঞ্চলের কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে। সে থেকেই বাকু'র মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠা। পরে আমার বন্ধু আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম ও বাকুর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর জানবাজ দল গঠন করা হয়েছিলো গ্রেনেড সাপ্লাই ও পাকসেনাদের উপর নিয়মিত হামলা করার উদ্দেশ্যে। আরেক বন্ধু মিলু বহেরাতৈল থেকে মাথায় করে বাক্স বোঝাই গ্রেনেড এনে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতো। পাকসেনা ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে ঐসব গ্রেনেড চার্জ করতাম। কাজও হতো বেশ। টাঙ্গাইলে জামাতে ইসলামের তৎকালীন আমির খালেক প্রফেসরের বাসার সামনেও আমরা বেশ কয়েকবার গ্রেনেড চার্জ করেছি। টাঙ্গাইলে পাকসেনারা আসার পর রূপবাণী হলে 'রোড টু সোয়াত' সিনেমাটি আবারও প্রদর্শিত হচ্ছিলো। এই সিনেমা বন্ধ করতে আমাদের বন্ধু হাফিজুল হক খান মেনু রূপবাণী হলের ভেতরে গ্রেনেড হামলা চালায়। হামলায় দুই-তিনজন নিহত ও অনেকে আহত হয়। নিহতদের মধ্যে মেইনরোডের একটি হার্ডওয়্যার দোকানের মালিকের ছেলেও ছিলো।

একাত্তরের ১৬ আগস্ট, রাত্রি। আবুল কালাম আজাদ বীর বিক্রম ও বাকু শহরের পাশেই ভাতকুরার নগর জলপাই গ্রামে যায়। ওদের পরিকল্পনা ছিলো ওখানকার বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার এক্সপ্লোসিভ ফিট করে ধ্বংস করা। ওরা যখন হামলা চালায় তখন ১৭ তারিখ ভোররাত্রি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, সে রাতে বৃষ্টি থাকায় ট্রান্সমিটার পোলের গোড়ায় শাবল দিয়ে খোড়া গর্তে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় এক্সপ্লোসিভ সেট করা সম্ভব হয়নি। ফলে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার ধ্বংস করা যায়নি। পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ভোরের দিকে তারা নিরাপদে ফিরে আসার চেষ্টা করতেই রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের ঘিরে ফেলে। সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ওদের। অনেকের ধারণা, হামলার কথা রাজাকার বাহিনী আগেই জেনে গিয়েছিলো। সম্মুখ যুদ্ধে পেরে উঠতে না পেরে কালাম ও বাকু পিছু হটার চেষ্টা করলে রাজাকারদের গুলিতে মারত্মকভাবে আহত হয় বাকু। ১১টি গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত হয় বাকুর শরীর, এমনকি ওর হাতের কব্জির হাড়ও ভেঙ্গে যায়। কালামকেও আহত অবস্থায় আটক করে ওরা। বাকুকে পুরাতন জেলখানার পাশে মহকুমা সদর হাসপাতালে নেয়া হয় রাজাকারদের ট্রাকে করে। ওর মুখ থেকে তথ্য বের করার জন্য গুলির ক্ষতের মধ্যেই বেয়নেট চার্য করে বর্বর রাজাকার সদস্যরা। সে সময় বাকুর চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন ডা. রেজাউল করিম। পরবর্তীতে তিনি বাকুর মেঝ ভাই মতিন আহমেদকে জানিয়েছিলেন, রাজাকারদের নির্মমতা সহ্য করতে না পেরে তিনি বাকুর শরীরে এমন একটি ইনজেকশন পুশ করেন যাতে সে অচেতন থাকে। হাসপাতালে সাড়ে তিন ঘন্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করার পর বাকু শাহাদৎ বরণ করে। যদ্দুর মনে পড়ে, হাসপাতাল থেকে বাকুর লাশ গ্রহণ করেছিলো ওর ভাই ডেপু। ঐদিনই বাকুকে সমাহিত করা হয় কেন্দ্রিয় কবরস্থানে। ১৭ আগস্ট ১৯৭১– সমাপ্ত হয় এক তরুণের জীবনের গল্প আর সূচিত হয় এক বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের ইতিহাস। এই তরুণ, এই মুক্তিযোদ্ধা আমার বন্ধু বাকু। বাকুর সাথে আমার শেষ দেখা ১৪ কিংবা ১৫ আগস্ট, দাইন্যা গ্রামে বন্ধু আব্দুর রশিদ লেবুর বাড়িতে। লেবু পরে সদর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলো, এখন প্রয়াত। ১৬ আগস্ট কয়েকজনসহ আমি পাথরাইল গিয়েছিলাম টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলের বেসামরিক প্রধান আনোয়ার হোসেন-এর সাথে দেখা করার জন্য। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ সেদিন আমাকে যেভাবে ব্যথিত করেছিলো, আমি আজো সেভাবে ব্যথিত হই। জন্মভূমির জন্য এক বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগ সেদিন যেভাবে আমাকে গর্বিত করেছিলো, আজো আমি সেভাবেই গর্ববোধ করি। আমার এই বীর বন্ধুর জন্ম ১৯৫৪ সালের ৫ মার্চ। বাকু নিয়মিত শরীর চর্চা করতো। আমিও করতাম। আমাদের অনেক বন্ধুও শরীর চর্চায় সঙ্গী ছিলো। বাকুর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বন্ধুরা মিলে বাহাত্তর সালে আমঘাট রোডের বিভিন্ন সাইনবোর্ডে শহীদ নজরুল ইসলাম বাকু সড়ক লেখার ব্যবস্থা করি। কিন্তু অফিসিয়ালি রাস্তার নামকরণ এই নামে না হওয়ায় তা অনেকেই ব্যবহার করেনি। আরো পরে শামসুল হক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে অফিসিয়ালভাবে কলেজ পাড়া থেকে কাগমারা যাবার সড়কটি বাকুর নামে নামকরণ করা হয়, যদিও পরে ক্ষমতার পালাবদলে সে নাম বদলে গেছে। এছাড়া ওর নামে একটি ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার তৈরি করার উদ্যোগ নেই। তৎকালীন দুই এমপি শামসুর রহমান খান ও সেতাব আলী খানকে নিয়ে কলেজ পাড়ার মুসলিম ইনস্টিটিউট মাঠে আমরা একটি সভাও করেছিলাম। তারা দু'জনেই এ কাজে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে এ উদ্যোগ সফল হয়নি। ৭৭ সালে আবারও উদ্যোগী হয়ে আমরা বাকু শরীর চর্চা কেন্দ্রের কমিটি গঠন করি এবং মুসলিম ইনস্টিটিউটের সেই মাঠে বেড়া দিয়ে একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করি। আনোয়ার ইসলাম রতন (মরহুম) সাধারণ সম্পাদক ও আমি সভাপতি নির্বাচিত হই। ৭৯ সালে তৎকালীন ক্রিড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ খান অনুদান দিলে ব্যায়ামাগারটি সরিয়ে আর্টিজেন ভবনের পাশে নিয়ে যাই।

বাকুর জন্য শেষ পর্যন্ত আমরা বন্ধুরা তেমন কিছুই করতে পারিনি। এটা আমাদের চরম ব্যর্থতা। আর তার মতো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য যাদের উদ্যোগ নেয়ার কথা ছিলো, সুযোগ ছিলো, দায়িত্ব ছিলো তারাও এগিয়ে আসেননি। অথচ ঘাতক রাজাকাররা বাকুর এই শহরে এখনও বহাল তবিয়তেই আছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এর চেয়ে নির্মম সত্য, এর চেয়ে বেদনাদায়ক অনুভূতি আর কী হতে পারে! ■

● লেখক: নির্বাহী পরিচালক
বুরো বাংলাদেশ

আনোয়ার হোসেন, সাবেক বেসামরিক প্রধান কাদেরিয়া বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চল

শহীদ নজরুল ইসলাম বাকু'র বড় ভাই মতিন আহমেদ-এর সাথে (ডানে) প্রত্যয় সম্পাদক ফেরদৌস সালাম ও বাকু'র সহযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ, বীর বিক্রম এবং (বাঁয়ে) বাকু'র ভাতিজা রফিক

একজন শহীদ নজরুল ইসলাম বাকু

আবুল কালাম আজাদ, বীর বিক্রম

নিরবে নিভৃতে একাকী থাকলেই মনে পড়ে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে সহযোদ্ধা শহীদ নজরুল ইসলাম বাকুর কথা। নজরুল ইসলাম বাকু– ওকে বাকু বলেই ডাকতো সবাই। বাকুর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবান আইনজীবী এডভোকেট সিরাজউদ্দিন। গ্রাম কলেজ পাড়া। আর আমার বসবাস পারদিঘুলিয়া। একই এলাকা– আমি পশ্চিমে, বাকু পুবে। ব্যবধান পাঁচশত গজ মাত্র। বাকু আমার বয়সে ছোট হলেও বন্ধুর মতো তুমি আমি সম্পর্ক। মেলামেশা মাখামাখি না থাকলেও সম্পর্কটা ছিল মধুর। বাকুদের বাসার সম্মুখ দিয়েই যাতায়াত ছিল আমার সকাল বিকাল। বাকুর ইমিডিয়েট বড় ভাই ঢেপু ছিল আমার সমবয়সী। বাকু আর ঢেপুর মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক ছিল না। দুই ভাই দুই রকম ছিল। শৈশবকালে অধিকাংশ ছেলে মেয়েই চঞ্চল হয়ে থাকে। কিন্তু বাকু তেমন ছিল না। বাকুদের বাসার সম্মুখে একটা ব্যায়ামাগার ছিল। আমার বন্ধু বুরো বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকির হোসেন-এর বাসার পেছনেই ছিল এই ব্যায়ামাগার। ডানপিটে বাকু নিয়মিত ব্যায়াম করত, যে কারণে বাকুর স্বাস্থ্য ছিল বেশ পেটানো। বাকু ছিল খুব সাহসী এবং গোয়ার ধরনের। কোনো রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে বাকুকে দেখা যায়নি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। ১৯৬৭ সালে আমি তখন সন্তোষ জাহ্নবী হাই স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র, ছাত্রলীগের সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

আমার যতটুকু মনে আছে, দিনটি ছিল ১৯৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। চিন্তায় দিশেহারা, ফুল পাচ্ছি না। তখনকার সময়ে আমরা অন্যের বাগান থেকে ফুল চুরি করে এনে শহীদ মিনারে ফুল দিতাম। এখনকার মতো টাঙ্গাইল শহরে ফুলের দোকান ছিল না যেখানে ফুলের তোড়া পাওয়া যেত। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭, রাত তখন ৯টা বাজে। রূপবাণী সিনেমা হলে সিনেমা দেখে বের হয়েছি মাত্র। দেখা হলো কাগমারী পালপাড়ার ৩/৪ জন ছাত্রলীগ কর্মীর সাথে। হলের উত্তর পাশে টাইপ রাইটারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাকু। বাকুর সাথে একজন ছিল। ছাত্রলীগ কর্মীদের বললাম– তোমাদের পাড়ায়তো ফুল আছে, আমাকে কয়েকটা ফুল দাও। ওরা বললো, সব ফুল চুরি হইয়া গেছে। আমরাইতো ফুল পাইতাছি না, আপনেরে দিমু কনথিকা? ওরা চলে গেল। চিন্তায় পড়ে গেলাম, ফুল পাবো কোথায়?

বাকু কথাগুলো শুনে আমাকে বললো, এক জায়গায় ফুলের বাগান আছে আমি জানি। তবে চুরি কইরা আনন লাগবো। আমি বললাম– কনে? বাকু বললো চল যাই– গেলেই দেখতে পাবি। দেরি না করে বাকুর সাথে চললাম ফুল চুরি করার জন্য। যেতে যেতে পুলিশ প্যারেড মাঠ পার হয়ে পূর্বপাশে চলে গেলাম। মোনসেফ সাহেবের বাসা। চারদিক দেয়ালে ঘেরা। বাসার ভিতরে নিবু নিবু এক বিজলী বাতি জ্বলছে। তখন রাত ১০টা ৩০ বেজে গেছে। গেটের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাসার ভেতরটা নিরব ছিমছাম। নানা প্রজাতির ফুল আমাদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। বাকু বললো, তুই বাইরে

খাড়া, আমি ফুল তুইলা আনি। বললাম– আমিও যাই। বাকু আর আমি ওয়াল টপকিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে ৮/১০টা ফুল তুলে আমার খদ্দরের পাঞ্জাবীর পকেটে রাখলাম। ফুল নিয়ে ওয়াল টপকাতে যখন দেয়ালের উপরের দিকে উঠেছি, তখন ঐ বাসার কুকুর রা রা করে ডাকতে ডাকতে তেড়ে এসে বাকুর লুঙ্গি কামড়ে ধরেছে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মোনসেফ সাহেব আর লাঠি হাতে বাসার কাজের লোক। মোনসেফ সাহেব কুকুরটাকে নিবৃত করার চেষ্টা করছে। অবশেষে কুকুরটাকে নিবৃত করে কাজের লোকটা দূরে নিয়ে গেল। আমি দেয়ালের উপরে উঠে বসে রইলাম বোবা হয়ে। বাকু লুঙ্গিটা পড়ে নিল। মোনসেফ সাহেব আমাকে বললেন– এই ছেলে নামো। আমি দেয়াল থেকে নেমে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মোনসেফ সাহেব বললেন– চুরি করতে বাসার ভেতরে ঢুকেছো। তোমরা চোর, তোমাদের পুলিশে দিব। কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বাকু বলল আমরা চোর না। আমরা ফুল নিতে আইছি। কাইল একুশে ফেব্রুয়ারি, শহীদ মিনারে ফুল দিমু।

মোনসেফ সাহেব বললেন রাত করে কেন, দিনের বেলায় কি করলে? বাকু বলল– সারাদিন অন্যকামে ব্যস্ত আছিলাম। বিকালে অনেক জায়গায় খুঁইজা দেখছি ফুল নাই। তাই আপনের বাসায় আইছি। মোনসেফ সাহেব ধমক দিয়ে বলল– কোন স্কুলে পড়াশোনা করো? বাকু বলল– বিন্দুবাসিনী স্কুলে। মোনসেফ সাহেব বললো– ও। যাও আর কোনোদিন ফুল চুরি করবা না। আমরা মাথা নিচু করে চলে এলাম। বাকু আমাকে বলল, তুমিতো কোনো কথা কইলা না? আমি বললাম, ডরাইয়া কিছু কইতে সাহস পাই নাই। বাড়ি ফেরার সময় বাকু বলল, কয়টার সময় ফুল দিবা? বললাম, ভোরে। বাকু বলল আমিও যামু তোমাগো সাথে। ভোরবেলা আমি, প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা ফারুক, হীরা, অনু, শাজাহান, ১০/১২ জন হবে, ফুল হাতে নিয়ে কনকনে শীতের মধ্যে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে গান গাইতে গাইতে বাকুদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। গানটি হলো–

বাংলা মার দুর্নিবার
আমরা তরুণ দল,
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন
সংকটে অটল।
এই যে দেশ মোর স্বদেশ
সুধা সমুজ্জ্বল
বাংলা মার দুর্নিবার
আমরা তরুণ দল।
ক্ষুদিরাম বাঘা যতীন
প্রীতিলতা দি
তোমাদের আত্মত্যাগ

আজও ভুলিনি–

দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম ঘন কুয়াশার মধ্যে বাকু ওদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বাসার সামনে দিয়ে যেতেই বাকু আমাদের মিছিলে যোগ দিল। এইটুকু ছাড়া কোনোদিন কেনো সময় বাকুকে রাজনৈতিক সংস্পর্শে আমি দেখিনি।

১৯৭১-এ যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো তখন আমরা জোগারচর ক্যাম্পে বসে শুনতে পেলাম বাকু আর মজনু গুণ্ডা নামে দুইজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে টাঙ্গাইল থানায় আটকে রেখেছিল পরে থানা থেকে ওরা কৌশলে পালিয়ে গিয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাকুর সাথে যখন আমার দেখা হয়, তখন বাকুর মুখে সে ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে পারি। থানা থেকে বাকু যেভাবে পালিয়েছিল সে এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। পুলিশের টেবিলের সামনে থেকে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে হ্যাণ্ডকাপ পড়া অবস্থায় বাকু দক্ষিণ দিক দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আফজাল চৌধুরীর বাড়ির পিছনে পাট খেতে লুকিয়েছিল। সকালের দিকে আফজাল চৌধুরীর ছেলে কাশেমের সাথে দেখা হয়। কাশেম হ্যাক স' ব্লেড এনে পাট খেতে বসে বাকুর হ্যান্ডকাপ কেটে দেয়। তারপর বাকু চলে আসে।

আমরা যখন ভুয়াপুর ডাকবাংলোয় অবস্থান করি, সেখানে ছিলেন এ.এম. এনায়েত করিম, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, বুলবুল খান মাহবুব, কোম্পানি কমান্ডার আ. গফুর বীর প্রতীক, আ. হামিদ ভোলাসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণ। করিম সাহেব, মোয়াজ্জেম সাহেব, গফুর কমান্ডার ও বুলবুল খান মাহবুব একত্রে বসে একটা কাউন্সিল করে সিদ্ধান্ত নেন যে, টাঙ্গাইল শহরের ভেতরে আর্মি ক্যাম্প, রাজাকারদের ক্যাম্প, আলবদর ক্যাম্প এবং দালালদের আস্তানায় হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করা হবে। যাতে করে হানাদাররা শহরেই ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং অনায়াসে শহর ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় মুভ করতে না পারে। কোম্পানি কমান্ডার গফুর সাহেব তার কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের কথা বললেন। এনায়েত করিম আর মোয়াজ্জেম সাহেব শহরের অপারেশনের দায়িত্বটা আমার উপর দিয়ে বললেন– কালামের সাথে আর কে যাবে? এ সময় পেছন থেকে দাঁড়িয়ে একজন বলে উঠলো– আমি যামু। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বাকু। বাকুকে দেখে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবাক হয়েছিলাম, বাকু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে দেখে। যে ছেলেটি কোনোদিন রাজনীতির ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়নি, যে ছেলেটি গাড়ির হেলপারি করে, সেই ছেলেটির ভেতর দেশাত্ববোধ জাগ্রত হলো কি করে? মুক্তিযুদ্ধে বাকুর অংশগ্রহণ আমার ধারণাটাই পাল্টে দিয়েছিল। আমার সহযোদ্ধা বাকু মে মাসের ২য় সপ্তাহে হাফিজুল হক খান মেনুকে নিয়ে একবার এসেছিল টাঙ্গাইল শহরে। রূপবানী সিনেমা হলে গ্রেনেড মেরে চলে গিয়েছিল। এরপর আমার সাথে বাকু...।

আমরা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত জুনের পাঁচ তারিখে সকাল ১১টার সময় ১০টা গ্রেনেড নিয়ে টাঙ্গাইল শহরের উদ্দেশ্যে ভুয়াপুর থেকে যাত্রা শুরু করি। বাকুর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছোটবেলার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধে এসেই বেশি হয়েছিল। কারণ, ছোটবেলায় মাঝে মাঝে খেলার সময় ২০/২৫ মিনিট, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু কথা হতো। আর মুক্তিযুদ্ধে একসঙ্গে পথচলা, এক বিছানায় ঘুমানো, এক বাসনে খাওয়া আর এক ঘাটে গোসল করা নিত্যদিনের নিয়ম-অনিয়মের কর্মকাণ্ড। ঘনিষ্ঠ হয়ে বাকুর সাথে মিশে দেখেছি বাকু ছিল খুব সাহসী গোয়ার ধরনের, ঘাড় ত্যাড়াও বলা যেতে পারে। ওর একটা বদ অভ্যাস ছিল, একটু পর পর বলতো আমার ক্ষিদা লাগছে আর দোকান সামনে পেলেই মুড়ি, আটার বিস্কুট এমনকি কাঠিওয়ালা লেবনচুষ কিনে খেতো। আমি যদি না খেতাম তখন আমাকে বলতো বেশি ফুটানি কইরোনা, খাইয়া দ্যাহো কি মজা। অথচ আটার বিস্কুটগুলো এক/দেড় মাস আগের। বোটকা গন্ধ ছুটে গেছে। আমরা ভুয়াপুর থেকে টাঙ্গাইল আসার পথে সল্লা গিয়ে এক বাড়িতে রাত যাপন করলাম। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে রওনা হলাম টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে। সল্লা বাজারে এসে দেখলাম বাজার বসেছে। বাকু বললো– আমার খিদা লাগছে, দুধ খামু। দুই সের দুধ কিনলাম আট আনা দিয়ে। কিন্তু আমাদের কাছে দুধ নেওয়ার পাত্র ছিল না। এখন কি করি? আমি বাকুকে বললাম– দুধ কিনলাম, নিমু কেমনে, আমাগো কাছে তো জগ বা ভার নেই। বাকু বললো– ভার লাগবো ক্যান? এখনি কাচা দুধ খামু। তুই খা এক সের, আমি খাই এক সের। বাকু ঢক ঢক করে হাড়ি ধরে দুইসের দুধ খেয়ে ফেললো! আমি কাচা দুধ খেলাম না। তারপর আমরা চলে আসি টাঙ্গাইল শহরের পশ্চিমে পাচকাহনিয়া আব্দুর রশিদ লেবুর বাড়িতে। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাকু আর আমার পরিচিত বন্ধুদের ডেকে রাতের বেলায় বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলাম। রাজাকার, আলবদর আর আর্মিদের ক্যাম্প কোথায় আছে সেই খবর আনা নেয়ার জন্য ৮ জনের একটি গ্রুপ করে দিলাম। জুনের ৭ তারিখে বসে ঠিক করলাম প্রথম অপারেশনটা কোথায় হবে। বাকু বললো– দুই জায়গায়। আমি বললাম– ঠিক আছে তুই থানায় গ্রেনেড মারবি আর আমি মারবো খোকা রাজাকারের বাসার বারান্দায়। রাতে রাজাকাররা ঐ জায়গায় থাকে।

জুলাই মাসের ১৫ অথবা ১৬ তারিখে আমরা

থানায় অপারেশন করার জন্য স্থির করলাম। রাত ১১টার সময় কলেজপাড়ায় প্রয়াত নেতা সাবেক সংসদ সদস্য শামসুর রহমান খান শাহজাহান সাহেবের বাসার পাশে একটু খালি জায়গায় ঘর ছিল, সেখানে আমরা অবস্থান নেই। রাত বারোটার সময় রাস্তায় বেরিয়ে দেখি উত্তর দিক থেকে বাকুদের বাসার সামনে দিয়ে একজন লোক কাঁধে ঝোলা আর রাইফেল নিয়ে দক্ষিণ দিকে আসছে। আমি বললাম– বাকু দ্যাখ তগো বাসার সামনে রাইফেল কাধে একজন লোক আসতেছে। বাকু বললো– ও যদি রাজাকার হয় তাইলে এহানেই ওরে মাইরা ফালামু। আমি বললাম– না এহানে মারন যাব না। শালায় চিক্কির দিবো। ওরে তাজা ধরন লাগবো। বাকু বললো– ঠিক আছে আমি একটা জিগার ডাইল নিয়া আহি। ঐ

বাড়িতেই জিগা গাছ ছিল, গাছ থেকে ডাল ভেঙে আনলো। আমি বললাম– গেট পার হয়ে গেলেই পিছন থিকা ডাইল পিঠের মধ্যে ধরমু, ওমনি তুই পাছরাইয়া ধরবি। যেমন কথা তেমন কাজ, লোকটা রাজাকার। যখন আমাদের সামনে দুই পা এগিয়েছে ঠিক তখনই আমি পিঠে জিগার ডালটা ঠেকিয়ে বলেছি হল্ট, হ্যান্ডস আপ। রাজাকারটা ওমনি হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাথে সাথে বাকু রাজাকারকে জাপটে ধরেছে। রাজাকারটা চিৎকার করে উঠেছে– ওরে বাবারে, আমি রাজাকার বাবা, আমি মুক্তি না রাজাকার। তখন আমি রাজাকারের রাইফেলটা নিয়ে নিলাম। তারপর ওর মুখ চেপে ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলাম। এর মধ্যে বাকু রাজাকারের চুল ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে ফেললো। বাকু ওকে তখনই মেরে ফেলবে। আমি বললাম– এখানে ওরে মারন যাবো না, লোকজন আইসা পরবো, মিলিটারি আসবো। তখন আমরাই বিপদে পরমু। চল যাই ওরে নিয়া নিরিবিলি জায়গায় যাই। সেখানে গুলি কইরা মারমুনি। বাকু আমার কথা মেনে নিল। রাজাকারটাকে হাত পিছনে বেঁধে নিয়ে গেলাম ধরের বাড়ি খালের মধ্যে। রাত তখন প্রায় দুইটা বেজে গেছে। নিরব নিস্তব্ধ এলাকা। বাকু রাজাকারের বুকে লাথি, কিল-ঘুষি মারতে লাগলো। আমার কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে নিলো গুলি করবে। রাজাকার একবার আমার পা ধরে আরেকবার বাকুর পা ধরে বললো, আমারে মাইরা ফালান তাতে আপত্তি নাই। মারার আগে আমার দুইটা কথা শুনেন। বাকু বললো– শালা কি কথা কইবি? রাজাকারটা বললো– আমি খুব গরিব মানুষ। আমার বৌ আর দুইটা ছোট ছোট পোলাপান আছে। কামলা দিয়া খাইতাম। কামলা যেদিন না দিতাম সেদিন মাইনষের বাইতে সিং খুইদা চুরি করতাম। আবার কোনো কোনো দিন না খাইয়াও থাকতাম। আমি ইচ্ছা কইরা রাজাকার হই নাই। আমারে খোকা কমান্ডার জোর কইরা রাজাকারে ভর্তি করছে। কইছে, তুই মাসে দুইশ কইরা ট্যাহা পাবি। তাই আমি ২০/২৫ দিন ধইরা রাজাকার অইছি। এহন আমি মইরা গেলে বৌ পোলাপান না খাইয়া মরবো, আমারে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করেন। আমি আর রাজাকারে থাকমু না, নয় মাইরা ফালান। রাজাকারের কথা শুনে বাকু থেমে গেল। আমাকে বলল– কি করবি অহন? নিরীহ মানুষ মাইরা কি ওবো। রাজাকারকে বাকু বললো– তরে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করলে বেঈমানি করবি নাতো? রাজাকার বললো নাগো স্যার। বেঈমানি করমু ক্যান। আপনেরা আমারে বাঁচাইয়া রাখলেন তারপরেও কি বেঈমানি করণ যায়? বাকু বললো চল তরে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করমু। তারপর রাজাকারটাকে নিয়ে গেলাম জোগার চর। সেখানে কোম্পানি কমান্ডার হাবিবুল হক খান বেনুর কোম্পানিতে রেখে এলাম।

আগস্টের ৬ তারিখ আমাদেরকে আরো নতুন দায়িত্ব দেওয়া হলো। পাওয়ার হাউস ট্রান্সফরমার এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ধ্বংস করতে হবে। যাতে ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে টাঙ্গাইল শহরে কোনো প্রকার সভা এবং উৎসব করতে না পারে হানাদাররা। গ্রেনেড মেরে সব তছনছ করে ফেলতে হবে। দায়িত্ব নিয়ে চলে আসি শহরে। পাওয়ার হাউস রেকি করে দেখি হানাদাররা পাওয়ার হাউস ট্রান্সফরমারের চতুর্দিকে পাহারায় রয়েছে। ঐ পাহারা ভেদ করে ট্রান্সফরমারে এক্সপ্লোসিভ সেট করা সম্ভব হবে না। বাকু বললো– কি করা যায় কালাম? অন্য কোনো জায়গায় ট্রান্সফরমার আছে কি? আমি অনেক চিন্তা করে বললাম আছে– ভাতকুরা। সেটা ছোট ট্রান্সফরমার। বাকু বললো– এটাই ধ্বংস করমু। আমি বললাম ঠিক আছে তাই হবে। কিন্তু কমান্ডার গফুর ভাই বইলা দিছে পাওয়ার হাউসের ট্রান্সফরমার ধ্বংস করতে। তার নির্দেশ অমান্য করা কি ঠিক হবে? বাকু বলল, রাখতো নির্দেশ। পাওয়ার হাউস না হইয়া গ্রামের ভিতরে ছোট ট্রান্সফরমার হইলেও ট্রান্সফরমার তো। চল যাই। বললাম– চল কি আর করা? বাধ্য হয়েই বাকুর কথা মানা হলো। বাকু আর আমার মধ্যে একটা সমঝোতা আছে। প্রায় সময় দু'জনে সমঝোতা করেই কাজ করেছি। বাকুর ঘারতেরামিটা আমি মেনে নিয়ে চলে গেলাম বাসাখানপুর আলমগীরদের বাড়িতে। সেখানে ভারি এক্সপ্লোসিভ, ৬০টি গ্রেনেড, বাইনাকুলার ও একটা পিস্তল রাখা আছে। খা খা করা রোদ– প্রচণ্ড গরম। বেলা বারোটা বেজে গেছে। আমি আর বাকু আলমগীরদের বাড়িতে আম গাছের নিচে বসে বসে বাতাস খাচ্ছিলাম। আমাদের সামনেই ছিল লম্বা এক নারিকেল গাছ। বাকুর গায়ে তখন বেশ ভালই জ্বর ছিল। গাছে নারিকেল দেখে বাকু বলল– আমার নারিকেল খাইতে ইচ্ছা করতাছে। তুই বয় আমি গাছে উইঠা নারিকেল পারি। বাকুর কথা শুনে আমি ধমক দিয়ে বললাম এহানে বয় ব্যাটা। গায়ে জ্বর নিয়া নারিকেল গাছে উঠবো? আমি আলমগীর আর ওর ভাই কাদেরকে বললাম, গাছে উঠে নারিকেল পারতে। ওরা বললো, এই ভর দুপুরে এতো লম্বা গাছে উঠন

যাব না। কি আর করা– হতাশ হয়ে আমি আর বাকু নারিকেল গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

দশ মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। হঠাৎ একটা নারিকেল ধপ করে পড়ে গেল গাছ থেকে। ঠিক যে নারিকেলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বাকু সেটাই। আমরা সকলেই অবাক হয়ে গেলাম! কি করে সম্ভব! ঘটনাটি বাসাখানপুর ছড়িয়ে গেল, আশপাশের মানুষ দেখতে এলো। বিষয়টি আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। বাকু যে নারিকেলটা দেখিয়েছিল সেই নারিকেলটাই পড়ে গেল? আমার এক পরিচিত বয়োবৃদ্ধ লোক আমাকে বললেন, সাবধানে চলাফেরা কইরো বাবা। যদি পারো দুই দিন জিরাইয়া নেও। বাকু নারিকেলটা ভাঙলো আমরা সবাই মিলে নারিকেল খেলাম। তখন বেলা ১টা বেজে গেছে। আলমগীরের মা আমাদের খেতে দিলেন। আমরা ভাত খেয়ে উঠলাম। সেদিন ছিল ১৩ আগস্ট। বাকুকে বললাম, কাল ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আজ সন্ধ্যায় খোঁজ নিতে হবে কাল কোনো উৎসব অথবা কোনো প্রকার সভা হবে কিনা। আমি আর বাকু আলোচনা করে রাত ৯টার সময় বেরিয়ে পড়লাম। লুঙ্গি-শার্ট মাথায় টুপি পড়ে একটা পিস্তল আর দুইজনের কাছে চারটি গ্রেনেড কোমরে গুজে নিয়ে গেলাম। বিন্দুবাসিনী স্কুলের পিছন দিয়ে পুলিশ প্যারেড মাঠ ঘেষে টাউন প্রাইমারী স্কুলের ভিতর দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোড খাল পার হয়ে মিষ্টি পট্টির ভিতর দিয়ে চলে গেলাম কলেজপাড়া মোড়। দেখে এলাম ১৪ আগস্টের কোনো প্রস্তুতি মুসলিম লীগারদের আছে কি না। দেখলাম ওদের কোনো প্রস্তুতি নেই।

বাকুদের বাসার সামনে গিয়ে বাকু বললো– চল আমার ব্যায়ামাগারটা দেইখা আসি। গেলাম সেখানে, ব্যায়ামাগার তালা দেওয়া ছিল বলে চলে এলাম। বাকুকে বললাম এখন চল যাই যেকোনো সময় পাক আর্মি আসতে পারে। সেলিম কন্ট্রাক্টরের বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বাকু বললো পানির ট্যাঙ্কের ভিতর দিয়া যাই তাইলে কেউ দেখবো না। পানির ট্যাঙ্কের কাছে গেলে বাকু বললো বাড়ির কাছেই যখন আইছি, তাইলে বাড়িটা দেইখা যাই। আর যদি দেখবার ভাগ্য না অয়? বললাম ঠিক আছে চল। আমাকে বাকুদের বাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে বসিয়ে রেখে গাছ বেয়ে উঠে বাসার ঘরের চালের উপর দিয়ে নিচে নামলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাকু ফিরে এলো। রাত বারোটায় খানপুর আলমগীরের মামার বাড়িতে। ১৬ আগস্ট সকাল ১০টার সময় গেলাম পাঁচ কাহানিয়া লেবুর বাড়িতে। নাস্তা করে বাকু আমাকে বললো– রেডি হইয়া চল ভাতকুড়া যামু। আমি বললাম– বাকু, ভাতকুড়া যাইতে মনটা সায় দিতাছে না। চল ভুয়াপুর চইলা যাই, দুই দিন পরে আসি। বাকু বলল– চলতো, গেলেই মনে সায় দিবনে। তাছাড়া এ তারিখে তো কোনো অপারেশনই করতে পারি নাই, জবাব দিবি কি? বাকু বলল– আয় প্রতিজ্ঞা করি, ট্রান্সফরমার ধ্বংস না কইরা মুখে দানাপানি তুলমু না। প্রতিজ্ঞা করলাম। লেবুর মাকে সালাম করলাম। চাচি বললো– সাবধানে যাইও বাবারা। এক্সপ্লোসিভ, গ্রেনেড, পিস্তল, বায়নাকুলার নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম ভাতকুড়ার উদ্দেশ্যে।

তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলছে। কাগমারি ব্রিজের উপরে কয়েকজন পরিচিত পরীক্ষার্থীর সাথে দেখা হলো। বাকু আমার কানে কানে বললো– চল যাই, কাগমারী কলেজে বোমা মাইরা পরীক্ষা বন্ধ কইরা দেই। কথা শুনে রাগ করে ধমক দিয়ে বললাম– ধুর ব্যাটা, তর মাথায় কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নাই। যাইতাছি এককামে তা থুইয়া আর এক কামের কথা। আয় এইদিকে। বাকু মাঝে মাঝে নির্বোধের মতো কথা বলতো, নির্বোধের মত কাজ করতো। তবু ওকে আমার ভালো লাগত। কারণ, ওকে যেটাই বুঝাতে চাইতাম সেটাই বুঝতো।

আমরা ভালুককান্দি হয়ে কৈজুরির পথ ধরে চলে গেলাম ভাতকুড়া খাল পাড়ে। তখন খালে নতুন বানের পানি প্রবেশ করেছে। খালে কলকল করে স্রোত বইছে। খাল পারাপারের জন্য একটা গুদারা আছে। কিন্তু মাঝি নাই। খালের ওপারে খুটির সাথে গুদারার দড়ি বাঁধা আছে। দড়ি টেনে পার হতে হয়। বাকুকে বললাম– গ্রেনেড এক্সপ্লোসিভ কোথায় রাখা যায়? দিনের বেলায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরোন যাব না। বাকু বললো– ভাতকুড়া কবরখানা সানবান্দা পুরান কবরে রাখমু, চল যাই। বাঁধানো একটা কবরে চতুর্দিকে ছনগাছে ভর্তি, সেখানে রাখা হলো। চলে গেলাম বাচ্চু ড্রাইভারের বাড়িতে। বাচ্চু ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিলাম কোথায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার আছে; সেখানে গিয়ে আমরা দেখে এলাম। তখন বিকেল তিনটা বাজে। রাত ৮টার দিকে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সাতটা পর্যন্ত সময় কাটাতে হবে। চলে গেলাম খালের ওপার পাট খেতের ভেতরে। পুরো চার ঘণ্টা কাটালাম পাট খেতে বসে। বাকুর শরীরে তখন খুব জ্বর। আমার কোলে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে রইলো। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কি করবো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। নানান ধরনের কথা বলতে লাগলো বাকু। আমি খাল থেকে গামছা ভিজিয়ে মাথায় পানিপট্টি দিলাম। বাকু বললো, এই যে আমরা খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়া আরাম-আয়েশ, নিদ্রা হারাম কইরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতাছি, দেশ স্বাধীন হইলে কি সরকার আমাগো চিনবো? আমাগো দাম দিবো কেউ? আরো বললো– আইজ আমার বাবা মার কথা খুব মনে পড়তাছে, ভাই বোনগো কথা, আরো বেশি মনে হইতেছে মতিন দাদার কথা। দাদা আমারে খুব আদর করতো। দাদা জেলখানায় না থাকলে দাদাও মুক্তিযুদ্ধে আইতো। আমার হাত ধরে আর একটা কথা অনুরোধ করে বলেছিল হাত ধরে। দেশ স্বাধীন হবার পর কাদের সিদ্দিকী স্যারের কাছে কইয়া আমার ব্যায়ামাগারটা বড় কইরা দিবি। তাঁর সাথে তো তর খাতির বেশি, তর কথা শুনবো। আজ আমার বাকুর ঐ কথাগুলো বার বার মনে পড়ে। আর সকল দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

রাত আটটার সময় পাট খেত থেকে বেরিয়ে ভাতকুড়া কবরখানা থেকে অস্ত্রগুলো নিয়ে বাচ্চু ড্রাইভারের বাড়িতে চলে গেলাম। সেখান থেকে একটি শাবল আর মাটি তোলার বাঁশের চাক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলাম। বাকু এক্সপ্লোসিভের বোঝাটা মাথায় নিল। আমি বললাম– তর গায়ে প্রচণ্ড জ্বর, বোঝা আমার মাথায় দে। বাকু বললো– এহন আমার কোনো জ্বর নাই, চল যাই। বাচ্চু ড্রাইভারের বাড়ি থেকে পশ্চিমে বিলের উপর দিয়ে কোমর পানি ভেঙে হেঁটে যাচ্ছি। চতুর্দিকে গ্রামের ডিফেন্স পার্টির লোকেরা মশাল, টর্চলাইট, হারিকেন জ্বালিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে গ্রাম পাহারা দিচ্ছে আর বলছে গ্রামবাসীরা জাগো হে, হুশিয়ার জাগতে রহো। আমরা ট্রান্সমিটারের কাছে চলে এসেছি। ঐ ট্রান্সমিটার পোল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্বে ভাতকুড়ার ব্রিজ। রাজাকার পুলিশ ও পাক আর্মিরা ব্রিজ পাহারা দিচ্ছে। ব্রিজের উপরে সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ করে বাকু ক্ষেপে উত্তেজিত হয়ে গেল। আমাকে বললো– ব্রিজ পাহারায় যারা আছে তাগো উপরে হামলা করমু। আমি বললাম– তুইকি পাগল হইছস! আক্রমণ করার মতো অস্ত্র আছে? বাকু বললো– ক্যান, দুইজনের কাছে ৬০টা গ্রেনেড আছে। তোমার কাছে পিস্তল আছে, আর কি চাই? আমি বললাম– আরে পাগল, হেই অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করন যাবো না। তাছাড়া আমরা মাত্র দুইজন। আর ব্রিজে পাহারায় আছে কমপক্ষে পনের জন। অগো কাছে কমপক্ষে দুইটা এলএমজি আছে। অন্যান্য অস্ত্রও আছে। বাকুর আচরণ অস্বাভাবিক হলো কিছুটা।

অনেক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বাকু শান্ত হলো। তারপর ট্রান্সমিটার পোল ধ্বংস করতে পোলের গোড়ায় শাবল দিয়ে গর্ত খোড়া হলো। এমন সময় শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বড় বড় বৃষ্টির ফোটা শরীরে তীরের মতো বিদ্ধ হচ্ছে। এদিকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টির পানিতে গর্ত ভর্তি হয়ে গেল। এক্সপ্লোসিভ আর সেট করতে পারলাম না এবং বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার আর ধ্বংস করা গেল

না। গাঢ় অন্ধকার, তার উপর অচেনা পথ। আমি আমার কথা ভাবছি না, ভাবছিলাম বাকুর কথা। ওর গায়ে জ্বর। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে নিওমোনিয়া না হয়। খাল-বিল-জলাশয় পাড়ি দিয়ে অন্ধকারে এক বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এলাকার নাম জানি না, পুব-পশ্চিম চিনি না।

ওই বাড়ির মালিককে অনেক অনুনয় বিনয় করে রাতে আশ্রয় নিলাম। বাড়ির মালিক ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে আমাদেরকে আর একটা ঘরে আশ্রয় দিল। আমরা কারা পরিচয় জানতে চাইলো। বাকু বললো– আমরা মুক্তিযোদ্ধা, পাহাড় থিকা আইছি। রাস্তায় বৃষ্টিয়ে ধরছে, তাই আপনাগো বাইত্যে আইলাম। বাড়ির মালিক বললো– কিছু মনে কইরেন না, আমাগো এলাকায় কেউ রাজাকারের কথা কইয়া, কেউ মুক্তিবাহিনীর কথা কাইয়া ডাহাতি করে। আমি ভয়ে ভয়ে থাকি।

সারারাত বৃষ্টি। চোখে ঘুম নেই। বাকু জ্বরে কাতর। সারারাত আহ্ উহ্ করছে।

বিছানায় যাওয়ার আগে বাকুকে বললাম– বেলা উঠার আগে এই এলাকা ছাড়তে হবে মনে থাকে যেন। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম– এই এলাকার নাম কি? বললো– তারুটিয়া ভাতকুড়া। ভোর ৬টায় বিছানা ছাড়লাম। বাড়ির মালিক দুটো ফ্যান কচুর বড় বড় পাতা এনে দিল। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। আল পার হয়ে রাস্তায় উঠলাম, কচুর পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে। বাকুর মাথায় আড়াইশ পাউন্ডের এক্সপ্লোসিভের বোঝা। ভাবছিলাম কোনদিক দিয়ে যাবো? উত্তর দিক দিয়ে নিরাপদ গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘারিন্দা গিয়ে উঠবো। আর দক্ষিণ দিক দিয়ে ৫০ গজ সামনেই ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক পার হতে হবে। পুবে ভাতকুড়া ব্রিজে পাক সেনারা, পশ্চিমে নগর জলপাই ব্রিজেও পাক সেনারা।

বাকুকে বললাম উত্তর দিকে যাই, ঘারিন্দা দিয়ে ভুয়াপুর চইলা যামু। বাকু বললো– না, দক্ষিণ দিকে যাই। পাথরাইল দিয়া পারকাউইনা যামু। কথা কাটাকাটির পর বাকুর কথাই মেনে নিলাম। একটু পথ অগ্রসর হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম– পশ্চিম দিক থেকে তিনজন লোক আমাদেরকে ফলো করে আমাদের দিকেই আসছে। বিষয়টি বাকুকে দেখালাম, বললাম আমার সন্দেহ হইতাছে ওরা আমাগো বিপদে ফালাবো। বাকু আমার কথা পাত্তা দিল না। বললো– ও কিছু না। আমরা ম্যারাথন দৌড়ের মত করে এগুতে থাকলাম। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড পার হয়ে বর্তমানে (বিসিক নগরি) তৎকালীন আবাদি জমির আল ধরে খালের কাছাকাছি যেতেই ঐ গ্রামের তিনজন রাজাকার এসে আমাদের পথ গতিরোধ করে সামনে দাঁড়ালো। তিনজনের মধ্যে একজনের নাম আব্দুর রশিদ ভ্যান্ডার, একজনের নাম মোত্তালিব ড্রাইভার আর একজন ঠাণ্ডু। তিনজনই সহোদর ভাই। রশিদ ভ্যান্ডার বললো– মাথায় কি? নামা। বাকু বললো কাপড়ের গাইট, পাথরাইল বসাকবাড়ি যামু। মুত্তালিব বললো– গাইটে কি আছে দ্যাখা। এই নিয়ে তর্ক চললো কিছুক্ষণ। অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করলো। বললো– তোরা মুক্তিযোদ্ধা, তগো আমরা চিনি। মোত্তালিব ড্রাইভার বাকুকে বললো– বাকু তরে আমি ভালো কইরাই চিনি। তুইতো আমার ট্রাকেই এসিস্টেন্টগিরি করস। তুই মুক্তিবাহিনীতে গেছস। আমাকে রশিদ ভ্যান্ডার বললো– তোরেও চিনি ছাত্রলীগ করস। এইভাবে তর্ক করতে করতে কে পর্যায়ে বাকু চিৎকার করে বললো কালাম পিছনে চাইয়া দ্যাখ মিলিটারিরা আমাগো ঘেরাও দিছে। এই বলে বাকু জীবন বাঁচাতে দৌড় দিল। কোথায় গেল কোথায় দাঁড়ালো কিছুই জানিনা। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। আমি ডিফেন্স নিলাম। পাক সেনারা সংখ্যায় প্রায় শতাধিক। ওরা বৃষ্টির মত গুলি করতে করতে আমার দিকে আসতে থাকলো। আমি পাল্টা জবাব দিলাম। এক পর্যায়ে আমি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে রইলাম মাটিতে অজ্ঞান হয়ে। সেনারা এসে আমাকে ঘিরে রাখলো। আমি চোখ খুলতেই শুরু হলো পাশবিক নির্যাতন, যে যে রকম– যেভাবে খুশি। আমার সমস্ত শরীর রক্তে লাল হয়ে গেল। আমি নিশ্চিত হলাম খানিকক্ষণ পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। মনে মনে দোয়া দরুদ পাঠ করলাম। চতুর্দিকে তাকিয়ে খোলা আকাশটা ভালো করে দেখে নিলাম। হানাদাররা গামছা আর পাট গাছ দিয়ে আমার দুইহাত পিছন দিকে নিয়ে শক্ত করে বাঁধলো। তারপর নিয়ে গেল খাল পাড়ে। চোখ মেলে চেয়ে দেখি উবু হয়ে পড়ে আছে সুঠাম দেহধারী বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম বাকু। তখনও বাকু জীবিত ছিল। থানাপাড়ার রাজাকার ইকবাল আরো নয়টা গুলি করলো উবু হয়ে পড়ে থাকা বাকুর পিঠে। তখন আমার মনে হলো, গুলি বাকুর পিঠে লাগছে না। বিদ্ধ হচ্ছে আমার বুকে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বন্দিসেলে বসেই চিঠির মাধ্যমে জানতে পেলাম টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে বাকুকে নেয়ার পর বাকু শহীদ হয়েছে। বাকু ছিল আমার চেয়েও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। আমার সাহস ছিল কৌশল আর বুদ্ধিতে। বাকুর সাহস ছিল শরীরের উন্মাদনায়। বাকুকে যা বলতাম তাই করতো। ওর মুখে না শব্দটা ছিলই না।

স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরও বাকুর সব স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। কত ঘটনা কত কথা গোপনে রয়ে গেল। যতটুকু প্রকাশ করা যায় ততটুকুই তুলে ধরলাম। তবে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি যার ভেতরে কোনো স্বাধীকারের চেতনা ছিল না– সে কি করে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলো ভাবতে আমার এখনো অবাক লাগে। বাকুর মতো আরো হাজারো সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার সুযোগ পেয়েছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ■

● লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক কর্মী

আমরা তোমাদের ভুলবো না

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার

একাত্তরে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতার লাল সূর্য উদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদেরই একজন শহীদ জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার। এই বীর যোদ্ধা টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর সাহসী যোদ্ধাদের একজন।

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম তালুকদারের জন্ম ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শহর সংশ্লিষ্ট পশ্চিম পার্শ্বের গ্রাম বেড়াডোমায়। তার পিতা মরহুম হাবিবর রহমান ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মা জয়তুন নেছা। তাদের ৮ সন্তানের মধ্যে জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার ছিলেন সবার বড়। দিঘুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্র হিসেবে ছিলেন বেশ মেধাবী। ১৯৬৯ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করে ভর্তি হন কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজে। কিন্তু তার আর এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া হয়নি। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী তাদের বেড়ডোমা বাড়িতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই তাকে সঙ্গী করেন।

ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি সচেতন জাহাঙ্গীর ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি ছাত্রলীগ টাঙ্গাইল থানা শাখার সহসভাপতি ও ১৯৭০ সালে জেলা শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি কাগমারী এম এম আলী কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আনন্দ মজলিস সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি মগড়া, দাইন্যাসহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী কোম্পানি কমান্ডার লাবিবুর রহমানকে নাগরপুর থানা আক্রমণের নির্দেশ দিলে জাহাঙ্গীর তার সঙ্গী হতে চায়। কাদের সিদ্দিকী তাকে বলেন, তুমি এ কোম্পানির সদস্য নও। সে মুহূর্তে জাহাঙ্গীর জানায় ঐ এলাকার রাস্তাঘাট তার চেনা। এতে আক্রমণে সুবিধা হবে। তখন বঙ্গবীর তাকে ঐ যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দেন। কোম্পানি কমান্ডার লাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে জাহাঙ্গীরসহ অন্যান্যরা নাগরপুর থানা আক্রমণ করেন এবং তা দখল করে নেন। বঙ্গবীরের নির্দেশনানুযায়ী তারা কোনো পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে হত্যা না করে জনসম্মুখে ৫ ঘা করে বেত্রাঘাত করেন এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের সম্মতি সাপেক্ষে ছেড়ে দেন। তারা থানা থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। এরপর লাবিবুর রহমান তার কোম্পানি নিয়ে কেদারপুরে অবস্থান নেন। এ সময় লাবিবুর রহমান জানতে পারেন, খন্দকার বাতেনের নেতৃত্বাধীন একটি ৪০/৫০ জনের মুক্তিবাহিনী এ এলাকায় রয়েছে। তিনি তাদেরকে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানালে তাদের দু'জন প্রতিনিধি শাহজাদা ও শাজাহান কেদারপুরে আসেন এবং প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত একথা জানিয়ে লাবিবুর রহমানকে তাদের ক্যাম্পে যেতে আমন্ত্রণ জানান। তাদের কথায় বিশ্বাস করে লাবিবুর রহমান সাহসী সঙ্গী জাহাঙ্গীর ও অপর একজনকে সাথে নিয়ে ২৯ জুন তাদের ক্যাম্পে যাবার মুহূর্তে বাতেন বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে শহীদ হন। হত্যাকারী প্রতিক্রিয়াশীল এই গ্রুপ তাদের দু'জনের লাশ মুহূর্তেই নদীতে ডুবিয়ে দেয় যা আর পাওয়া যায়নি। এভাবেই বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবিবুর রহমান ও জাহাঙ্গীরকে হত্যার শিকার হতে হয়।

স্বাধীনতার পর শহীদ জাহাঙ্গীর আলম তালুকদারের নামে 'জাহাঙ্গীর সেবাশ্রম' নামে একটি হাসপাতাল ও জাহাঙ্গীর আলম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে তার পরিবার সদর উপজেলায় শহীদ জাহাঙ্গীর আলম উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

জন্মশতবর্ষে পিতাকে প্রণাম

যুগলপদ সাহা

মুজিব জন্মশতবর্ষের ভোরে
দোর খুলে যদি দেখতাম বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে দ্বারে
এমন মিথ্যা ভাবনা হাজারো সত্যের চেয়েও সত্য
তিনি আছেন কৃষকের লাঙ্গলের ফালে শ্রমিকের ঘামে
খেঁটে খাওয়া বাঙালির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে।
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
পিতা, জন্মশতবর্ষে তোমাকে প্রণাম।

Urdu and only Urdu shall be the State Language of Pakistan. No no no– গর্জে উঠল যৌবনদীপ্ত ছাত্রদের বজ্রকণ্ঠ। The Mother Language will be the State Language of the Country– প্রতিধ্বনিত হলো কার্জন হলের দেয়ালে দেয়ালে। আর্টস বিল্ডিং, জগন্নাথ হল, বেগম রোকেয়া হল, এ. কে. ফজলুল হক হল, মধুর ক্যান্টিন, গ্রন্থাগার– সারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর জেগে উঠলো। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বাংলা একাডেমি, গুলিস্তান, পল্টন মতিঝিল ছাড়িয়ে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার আন্দোলনে যারা ছিলেন প্রথম সারির নেতৃত্বে তাদের অন্যতম ছিলেন বজ্রকণ্ঠের সাহসী মুজিব। প্রতিবাদী আন্দোলনের মহানায়ক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বীজ রোপণ করে গেলেন অবাঙালি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আমাদের এই জ্বলে ওঠার সুযোগ করে দেয়ায় আপনাকেও ধন্যবাদ।

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি
হঠাৎ নোটিশ জারি হয়– খবরদার দূরে থাকো।
ঝরে পড়ে
গোলাপ পাপড়ি কাতারে কাতারে
সালাম বরকত রফিক জব্বার শহীদ হলো
রক্তেরাঙা রাজপথ,
আকাশে বাতাসে দুঃস্বপ্নের ছায়া বিচ্ছুরিত
পাহাড়-পর্বত, গ্রামে-গঞ্জে কিংবা অন্যত্রও
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, জেগে উঠল ছাত্রসমাজ
শহীদের রক্তে পল্লবিত হলো ভাষা আন্দোলন
নূরুল আমীনের রক্ত চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই– স্লোগানে মুখরিত বাংলা
রূপান্তরিত হলো 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই'
জয় বাংলার বীজ রোপণ করে গেলেন নূরুল আমীন,
আপনাকেও ধন্যবাদ।

১৯৫৪'র সংসদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল। ১৯৫৮'র অক্টোবরের ২৮ তারিখে লর্ড ক্লাইভের প্রেতাত্মা স্বরূপ আবির্ভূত হলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। জারি করলেন সামরিক শাসন, খুঁজে পেলেন মীর জাফর আলীর প্রেতাত্মা ময়মনসিংহের মোনায়েম খানকে, নিয়োগ দিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে।
১৯৬৬'র ৬ দফা ও পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে আইয়ুব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো শুরু করে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবকে পাঠিয়ে দেয়া হলো তার 'সেকেন্ড হোম' কারাগারে। ছাত্র

আন্দোলন রূপ নিলো গণ-আন্দোলনে। দেশব্যাপী একই সুর– জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো। আইয়ুবের চালাকি, ইয়াহিয়ার দুঃশাসন, ভুট্টোর একগুয়েমি– সব মিলিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক হ-য-ব-র-ল অবস্থা।

অপর দিকে শেখ মুজিবের ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, মাতৃভূমি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি, আল্লাহর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস, অপ্রতিরোধ্য ধিশক্তি তাকে একাগ্র করে তুলেছিল। তার এই শক্তির উৎস ছিল নির্যাতিত নিপীড়িত আর্থ-সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের বন্ধু মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আশীর্বাদ এবং ধৈর্যশীলা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছার ধিশক্তি, প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক চেতনা ও মৃত্তিকার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ।

১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শতভাগ বিজয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হলো ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। লৌহমানব আইয়ুব খান, দুঃশাসক ইয়াহিয়া, লারকানার জমিদারপুত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো– তোমাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র মুজিবকে ৭ মার্চের ভাষণে চরমপত্র পাঠ করতে বাধ্য করেছিলো। অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করায় তোমাদেরও ধন্যবাদ।

হে পিতা!
কী এক কবিতা শুনালে সাতই মার্চের ভাষণে তোমার
ধান ছাড়া খৈ ফুটলো বাংলার ঘরে ঘরে– তুর্কির মতো জেগে উঠলো
বাংলার দামাল ছেলেরা
বিচ্ছুরা সব ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুবাহিনীর উপর–
খালিহাতে কেড়ে নিল রসদ বেবাক
যুদ্ধ চললো নয় মাস আঠার মিনিটের ভাষণে তোমার
জন্ম নিলো বঙ্গবন্ধুর জয় বাংলা,
ভাসানীর কৃষক-শ্রমিক-জনতার বাংলাদেশ।

হে বঙ্গবন্ধু, তুমি কেন নও জগৎবন্ধু
তোমারি ঐ অঙ্গুলি হেলনিতে
যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হানাদার বাহিনীর উপর
কী এক অমর কবিতা শুনালে তুমি!
আঠার মিনিটের কবিতায়
মুক্তি পেল বাংলা, জন্ম নিল জয়-বাংলা– বাংলাদেশ
হে পিতা, জন্মশতবর্ষে তোমাকে প্রণাম।

৭ মার্চের ভাষণ পাকিস্তানি শাসকদের চৈতন্যে বাজালো ঘণ্টাধ্বনি। দুঃশাসক ইয়াহিয়া ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালির উপর লেলিয়ে দিল হানাদার বাহিনী। শুরু হলো নির্বিচার গণহত্যা। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ইয়াহিয়া মুজিবকে করাচি নিয়ে জল্লাদখানায় নিক্ষেপ করলেন। পাকিস্তানি শাসকদের শেষ চেষ্টাও হলো ব্যর্থ। মুজিব বললেন– আমি বাঙালি, আমি মুসলমান। আমার এক কথা। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, বাঙালির অধিকার চাই। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব– ইনশাআল্লাহ।

আইয়ুব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো– এই তিনে মিলে কষলেন অঙ্ক
অঙ্কতো নয়– শুভঙ্করের ফাঁকি
যোগ বিয়োগের কতই না আঁকিবুকি
ফল হলো শেষে– জয় বাংলার জয়, শেখ মুজিবের জয়।

পিতা! তোমার মানুষ পেট ভরে খাবে ভাত, ঘুমাবে শান্তিতে
আমরা আর ভয় করি না, ভরসা আছে বংশপ্রদীপ হাসনাহেনায়।

আমরা ভালো আছি, ভাল আছে তোমার জয়বাংলা
লাল সবুজের বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের তলাশূন্য ঝুড়ি হাতে
দেশ গড়ার কাজে হাত দিতে না দিতেই
লর্ড ক্লাইভের প্রেতাত্মা ভর করলো মুজিব পরিবারে
দুষ্টগ্রহ সৃষ্টিচক্রে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা হলেন শহীদ
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা প্রবাসী হাসনাহেনা
রয়ে গেলেন বংশপ্রদীপ, মুজিবকণ্ঠ
সোনার বাংলার ঘরে ঘরে জ্বালাবে বাতি জন্মশতবর্ষ জুড়ে।

হে পিতা!
তুমি চেয়েছিলে বন্ধ্যা মাটি চিরে গড়তে সোনার বাংলা
এতে কার কিবা এসে যায়, কিবা ক্ষতি হল কার!
কে দেবে সে হিসাব, কার কাছে পাব তার সঠিক জবাব
৩২ নম্বর শহীদ বেদীমূলে থমকে দাঁড়াই
নিয়তির হাতে অসহায় মানুষ।
পিতা তুমি শিখিয়েছ–
সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, বৈরিতা নয় কোথাও
প্রতিকার নয়, প্রতিরোধ করি
'আমরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি'।
কথা দিলাম হে পিতা

নব-প্রজন্ম গড়বে তোমার সোনার বাংলা।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো

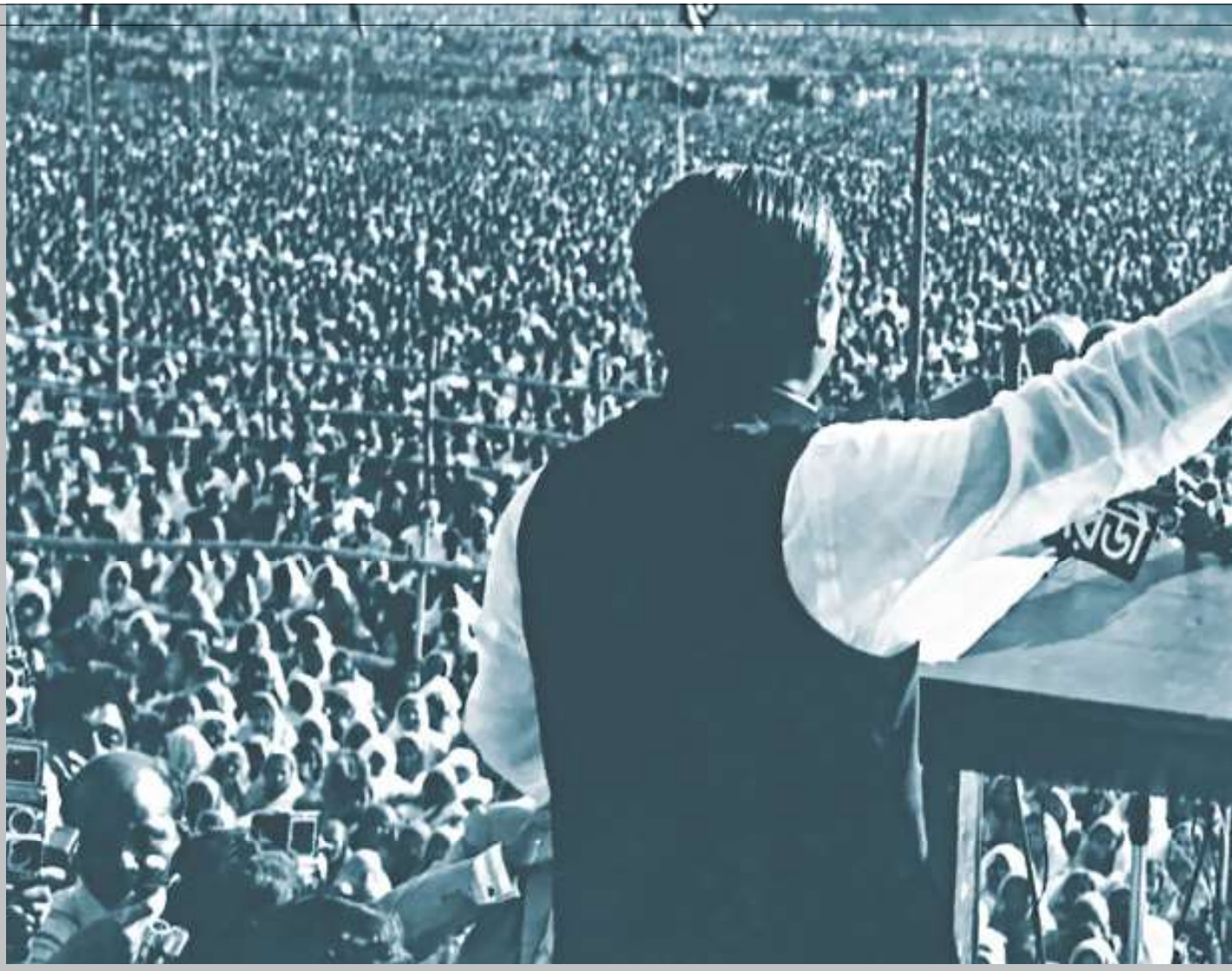

সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে: প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর

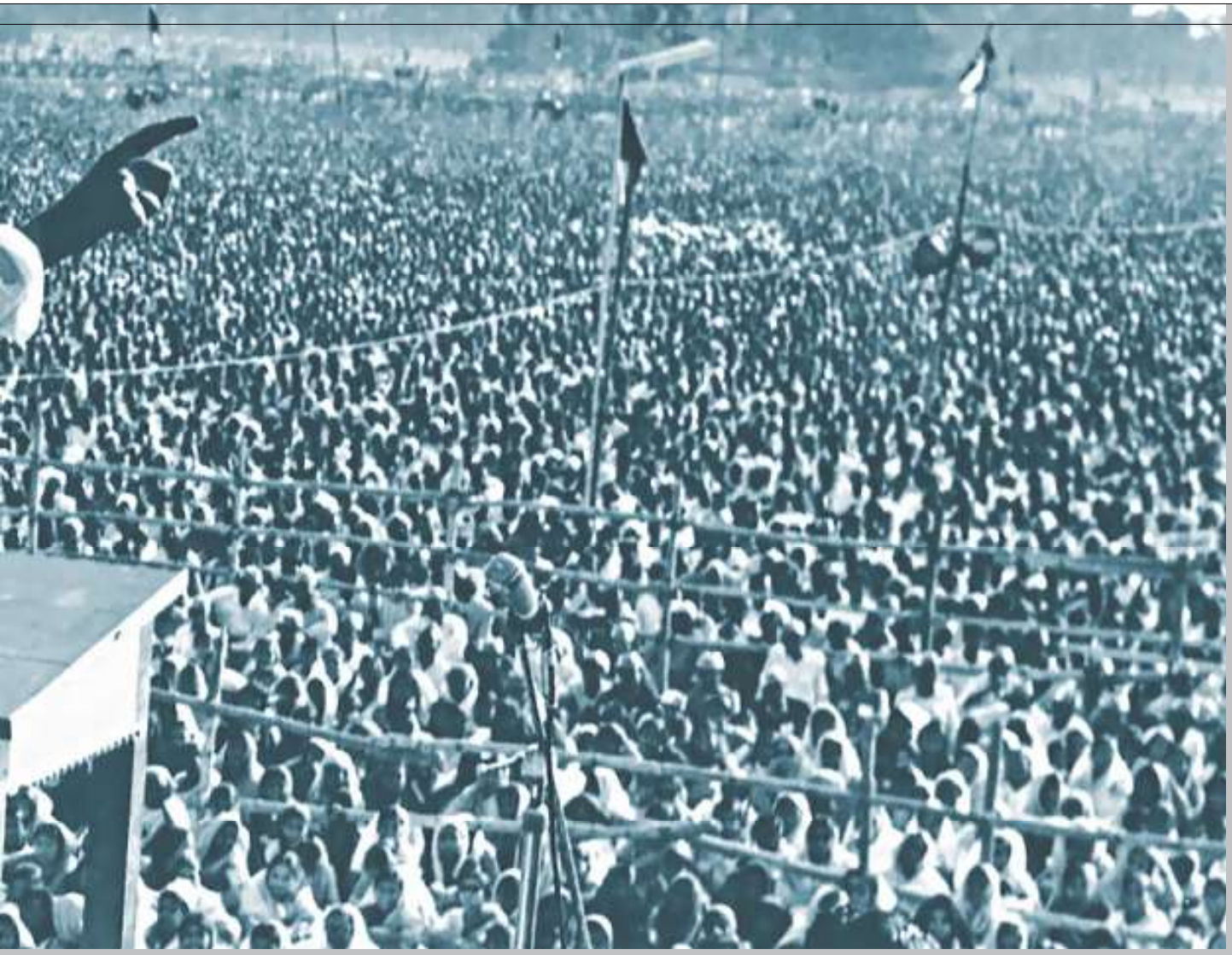

পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না।
আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্ণমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।
২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
জয় বাংলা।■

● সৌজন্যে : ইনফ্রারেড কমিউনিকেশন

বিদেশি সাংবাদিকের ক্যামেরায়

মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ছবি

১৯৭১ সালের ২৩ শে মার্চ ঢাকার রাস্তায় স্বাধীনতার দাবিতে হারপুন হাতে বিক্ষোভ মিছিল।

২ এপ্রিল ১৯৭১। যশোরে মার্চ করছে মুক্তিবাহিনী।

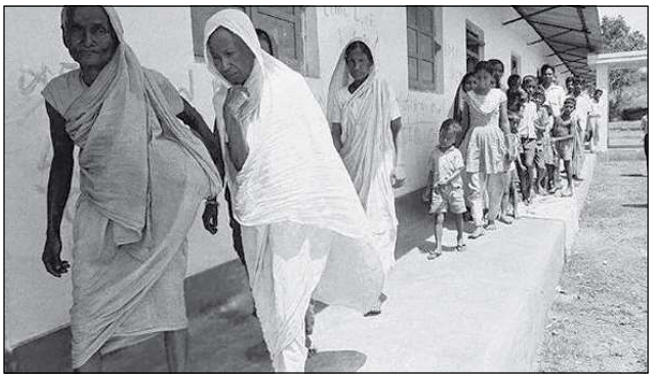

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। প্রাণ বাঁচাতে ভারতের ত্রিপুরার মোহনপুরের একটি স্কুল ভবনে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশিরা।

১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল। চুয়াডাঙ্গায় পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর বোমা হামলায় আহত একজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা দিতে নিয়ে যাচ্ছেন বেসামরিক মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধারা।

১৯৭১ সালের ৩ আগস্ট। ঢাকার কাছে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হেমায়েতউদ্দীন একটি গোপন ক্যাম্প থেকে মেশিনগান তাক করে রেখেছেন।

১৩ নভেম্বর ১৯৭১। ফরিদপুরে রাইফেল হাতে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ। ৭০ সদস্যের একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন একদম বামে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ১৯ বছর বয়সি তরুণটি।

১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পারুলিয়া গ্রাম দখল করে নেয় মুক্তিবাহিনী।

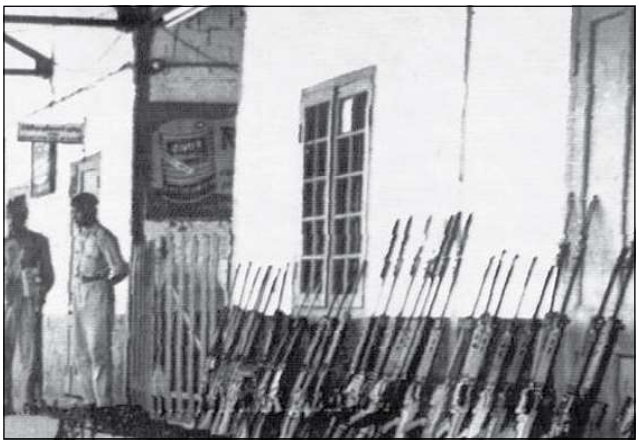

২৯ নভেম্বর ১৯৭১। আখাউড়ায় অস্ত্র পাহাড়া দিচ্ছে পাকিস্তানি সেনারা। তাদের দাবি ছিল, ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে এসব অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে।

২ ডিসেম্বর ১৯৭১। যশোরে পাকিস্তানি সেনাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে ভারত। এক পাকিস্তানি সেনাসদস্য রাইফেল নিয়ে অন্যত্র যাচ্ছে। অন্য সেনারা তখন অস্ত্র তাক করে পরিখার মধ্যে রয়েছে।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্যাংক বগুড়ার দিকে রওনা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর। ভারতীয় সীমান্তের কাছে ডোঙ্গারপাড়ায় খোলা মাঠে মেশিনগান তাক করে রেখেছেন এক ভারতীয় সেনা।

১২ ডিসেম্বর ১৯৭১। রাজধানী ঢাকার অদূরে একটি এলাকায় একজন পাকিস্তানি সার্জেন্ট দুই সেনাকে নির্দেশনা দিচ্ছে।

ছবি : এপি ● সূত্র : ডয়চে ভেলে

আমরা তোমাদের ভুলবো না

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সালাহউদ্দিন

মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ টাঙ্গাইলের আরেক কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মো. সালাহউদ্দিন। তার পিতা মরহুম মোহাম্মদ আইনউদ্দিন ছিলেন টাঙ্গাইল এতিমখানার সুপারিনটেনডেন্ট। তার মায়ের নাম মরহুম শামসুন্নেছা। তিনি ১৯৬৮ সালে অবসর গ্রহণের পর দুটি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। শহীদ মো. সালাউদ্দিনরা ৭ ভাই ৩ বোন। তিনি বাবা-মায়ের ৬ষ্ঠ সন্তান।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র সালাউদ্দিন বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করে ভর্তি হন করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী সা'দত কলেজে। এখানে তিনি পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তী নায়ক ও ছাত্রলীগ নেতা কাদের সিদ্দিকীকে সহপাঠী হিসেবে পান। স্কুল জীবন থেকেই ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত সালাহউদ্দিন ছিলেন শহর ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক। তিনি নিয়মিত কবিতা লিখতেন, আবৃত্তি করতেন এবং মঞ্চ নাটকেও অংশ নিতেন।

মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। ছাত্রলীগ নেতা ও সহপাঠী কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনী গঠন করলে তিনি তার সাথে সম্পৃক্ত হন। এ সময় তিনি বহেরাতলী, মহানন্দপুর ও সখীপুর মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইল শহরে বোমা বিস্ফোরক একটি দলের নেতৃত্বে। তিনি বোমা ও গ্রেনেড নিয়ে এসে তাদের আকুরটাকুর পাড়ার বাসার পাশে নওশের ম্যাজিস্ট্রেটের নির্মাণাধীন বাড়ির বালির ঢিবিতে লুকিয়ে রাখতেন এবং সুযোগ বুঝে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে হানাদার ও রাজাকারদের অবস্থানসহ পাকিস্তানপন্থী জামাত নেতাদের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতেন। এরই এক পর্যায়ে তিনি টাঙ্গাইল জামাতের আমীর কুখ্যাত খালেক প্রফেসরের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। ৪টি বোমার মধ্যে ২টি আংশিক কাজ করে। হানাদার বাহিনী তৎপর হয়ে সালাউদ্দিনকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। চরম নির্যাতনেও এই বীর মুক্তিযোদ্ধা তার সহযোদ্ধাদের নাম বলেননি।

এ সময় তার বাবা মা হানাদার মেজরের সাথে দেখা করলে তাদের পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেয়া হয়। আটক সালাহউদ্দিনের সাথে পরিবারের কারো দেখার অনুমতি মেলেনি। তার পিতার এতিমখানার রাজা নামের এক ছাত্র– যে অভাবের কারণে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, সে অত্যাচারে জর্জরিত সালাহউদ্দিনের সংবাদ বাসায় নিয়ে আসতো এবং তার জন্য ওষুধপথ্য নিয়ে যেতো। ১১ নভেম্বর আটক হন সালাহউদ্দিন এবং প্রতিদিন অমানুষিক অত্যাচারের পর ২৪ নভেম্বর তাকে টাঙ্গাইলের বধ্যভূমিতে গুলি করে হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সূর্যসন্তান সালাহউদ্দিনের লাশটি পরিবারকে দেয়া হয়নি এবং এমনকি তার মৃত্যুর খবরও পরিবারকে জানানো হয়নি।

যুদ্ধের পর বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী শহীদ সালাহউদ্দিনের স্মৃতি রক্ষার্থে টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের নামকরণ করেন 'শহীদ সালাহউদ্দিন পাঠাগার'। কিন্তু সে সময় সরকারি উদ্যোগের অভাব এবং পরবর্তীতে ক্ষমতার পালাবদলে সেই নাম মুছে ফেলা হয়।

উল্লেখ্য, শহীদ সালাহউদ্দিনের আরও ৩ ভাই মুক্তিযোদ্ধা। তারা হলেন মরহুম সিরাজুল হক, মরহুম মাজহারুল হক এবং মহিউদ্দিন খোকন।

স্বাধীনতার ৫০ বছর : কৃষির অগ্রগতি ও কৃষকের বাস্তবতা

এ বি এম তাজুল ইসলাম

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুরুতেই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। জাতির এই বীর সন্তানদের ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি দেশ, একটি পতাকা।

পৃথিবীর যেকোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন অপরিহার্য। বেশিরভাগ দেশেরই গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি রাষ্ট্রই কৃষি উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ১৯৭১ থেকে ২০২১ স্বাধীনতার ৫০ বছর মহাকালের হিসাবে হয়ত খুব বেশি সময় নয় কিন্তু একেবারে কম তাও নয়। সময়ের বিবেচনায় এই ৫০ বছরে আমাদের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হলেও কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিস্ময়করভাবে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে যার ফলশ্রুতিতে খাদ্য উৎপাদনে, বিশেষ করে ধান, আলু, সবজী, মৎস্য, মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে। কৃষি উৎপাদনে আমাদের অনেক অগ্রগতি হলেও এর মূল কারিগর কৃষকের জীবন মানের বাস্তবতা ভিন্ন। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের কৃষকরা উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। কৃষকের হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল ভোগ করে ফরিয়া এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা। খাদ্য ও খাদকের এ জগতে কৃষক শুধুই উৎপাদক নয়, নিজেও এক ধরনের খাদ্য। কৃষকের শ্রম খেয়ে জমিদার মোটা হয়েছে, রাজারা মহারাজ হয়েছে অথচ যে লোকটি সবার খাদ্য জোগায়, সে-ই থাকে খাদ্যশৃঙ্খলের সবার নিচে।

২০২১ সাল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতার পাঁচ দশকে খাদ্য উৎপাদনে আমরা কোন পর্যায়ে আছি এবং উৎপাদক কৃষকের জীবন মানের বাস্তবতা পর্যালোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

খাদ্য উৎপাদনে অগ্রগতি

কৃষি বিজ্ঞানীদের একান্ত প্রচেষ্টা কৃষিতে ফলিত গবেষণা, গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দ্রুত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো, ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তার এবং কৃষককের নিরলস পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশের কৃষির এ অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুনদের কৃষি কাজে অংশগ্রহণ এই অগ্রগতির অন্যতম কারণ। নিচের পর্যালোচনা থেকে স্বাধীনতার ৫০ বছরে কৃষির অগ্রগতি সম্পর্কে সহজে একটি ধারনা পাওয়া যেতে পারে।

দেশে প্রধান খাদ্য বলতে সাধারণত চাল থেকে তৈরি ভাতকে বোঝায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় পাঁচ দশকে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণের বেশি হলেও সব সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমে চাল উৎপাদনের পরিমাণ তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে তিন কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের তুলনায় দ্বিগুন, তিনগুন এবং কিছু কিছু ফসলে দশগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিগত দুই দশকে ফসলের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদেও আমাদের অসামান্য অগ্রগতি জাতিকে অপুষ্টিহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমাদের প্রাণিজ প্রোটিনের ৬০ শতাংশের যোগান দেয় মৎস্য খাত। যথাযথ গবেষণা এবং আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কারণে আমাদের আভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৪৩.৮৩ লক্ষ মে.টন যা আমাদের আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ তৈরি করেছে।

মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন দেশের অর্থনীতিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য

১৯৭১-৭২ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফসল সমূহের তুলনামূলক উৎপাদন চিত্র

ফসলের নাম	সাল	চাষকৃত জমির পরিমান (লক্ষ' একর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ' মেট্রিক টন)	প্রতি একর জমিতে ফসলের গড় উৎপাদন (মেট্রিক টন)
ধান	১৯৭১-৭২	২৩১.১৭	৯৭.৭৬	১.০৪
	২০১৮-১৯	২৮৪.৩৪	৩৬৩.৯০	১.২৭
গম	১৯৭১-৭২	৩.১৩	১.১৩	০.৮৮
	২০১৮-১৯	৮.১৬	১০.১৭	১.২৪
ভুট্টা	১৯৭১-৭২	০০		
	২০১৮-১৯	১১.০০	৩৫.৬৯	৩.২৪
আলু	১৯৭১-৭২	১.৮৭	৭.৪১	৩.৯৬
	২০১৮-১৯	১১.৫৮	৯৬.৫৫	৮.৩৩
পাট	১৯৭১-৭২	১৭.২৫	৪২.৮৭ লক্ষ বেল	২.৪৮ লক্ষ বেল
	২০১৮-১৯	১৮.৫২	৮৫.৭৬ লক্ষ বেল	৪.৬৩ লক্ষ বেল
ডাল জাতীয় শস্য	১৯৭১-৭২	৭.৬৫	২.৪৪	০.৩১

* ১ বেল = ১৮১.৪৩ কেজি

অনুযায়ী (২০১৮-১৯) দেশে বর্তমানে মাংসের বাৎসরিক চাহিদা ৭২.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং উৎপাদন ৭৫.১৪ লক্ষ মে.টন যা মোট চাহিদার ১০২.০৫%, সংখ্যায় বাৎসরিক ডিমের চাহিদা ১৭৩২.৬৪ কোটি এবং উৎপাদন ১৭০৯.৯৭ কোটি যা মোট চাহিদার ৯৭.৮৭% এবং দুধের মোট চাহিদা ১৫২.০২ লক্ষ মে.টন এবং বিপরীতে উৎপাদনের পরিমান ৯৯.২৩ লক্ষ মে.টন যা মোট চাহিদার ৬৪.৬৮%। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের প্রাণি সম্পদ বিষয়ক সঠিক তথ্য উপাত্ত না পেলেও গত এক দশকের উৎপাদন তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় এক দশকের ব্যবধানে দেশে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৯৬%, ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৯৮% এবং দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩১৮% যা পরিষ্কারভাবে দেশের কৃষি খাতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব। বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম। সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, ফল উৎপাদনে সপ্তম এবং মাছ উৎপাদনে চতুর্থ অবস্থানে উঠে আসা নিঃসন্দেহে এটি বিশাল অর্জন।

যাই হোক এই বিপ্লবের মুল কারিগরদের বাস্তবিক অবস্থার কিছু বিষয় আলোকপাত করে এ লেখা শেষ করব। কারণ, পেছনের কারিগরদের যথাযোগ্য মুল্যায়ন না হলে অগ্রগতির এই চিত্র উল্টোদিকে যাত্রা শুরু হওয়া অবাস্তব কিছু নয়।

কৃষকের বাস্তবতা

উন্নয়নের মহাসড়ক দিয়ে যেতে যেতে আমরা দেখি, রোদ-বৃষ্টিতে জমিতে উবু হয়ে কাজ করে যাচ্ছে রুগ্ন ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের একটি-দুটি বা কয়েকজন লোক। তাদের সব কর্মযজ্ঞ ওই মাটিঘেঁষা। এই মাটির পোকারাও কখনো কখনো মাথা তোলে: আকালে, বন্যায়, মড়কে বা বিদ্রোহের সময়। বাদবাকি সময় তাকে শুষে খায় মহাজন, জমির মালিক, সারের ডিলার, সেচকলের মালিক, কীটনাশক কোম্পানি, দালাল, ফড়িয়া, মধ্যস্বত্বভোগীরা। তবে আখেরি মারটা চালকল মালিকের। ফড়িয়ার কাছে কম দামে ধান বেচতে বাধ্য করে তারা। তখন পত্রিকায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া মানুষের যেসব ছবি ছাপা হয়, তা কেবল কৃষকের নয়, তার ক্যাপশনের নাম গ্রামীণ অর্থনীতি।

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে হতাশ কৃষক ধানের জমিতে আগুন দেয়, সড়কে ঢালে ভ্যানভর্তি সবজি, পিচঢালা কালো সড়ক সাদা হয় খামারির ঢেলে দেওয়া দুধে, এর মধ্যে ভুক্তভোগী কৃষকদের কেউ কেউ আবার আত্মহত্যাও করে। আকাশ আর মাটির মাঝখানে লম্বালম্বি ঝুলে থাকা কৃষকের প্রাণহীন দেহকে তখন মনে হয় এক বিস্ময়চিহ্ন! সত্যিই কৃষক এক বিস্ময়! খাদ্যশৃঙ্খলের তলার এই মানুষটি বিত্ত, মর্যাদা ও ক্ষমতার পিরামিডেরও একেবারে তলার লোক তাই আধুনিক সমাজে উঁচুতলার মানুষের কাছে 'চাষা' হয়েছে গালির সর্বনাম, যেন এরা মানব উচ্ছিষ্ট । কৃষকের চলনবলন থেকে যে যত দূরে, সে নাকি ততটাই 'ভদ্রলোক'। কৃষকের দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে ভদ্রলোকেরা সর্বদা কৃষকের বিপক্ষেই ছিল ।

পুঁজিবাদের আগের সব সমাজই ছিল কৃষিসমাজ। কৃষক বাজার অর্থনীতি আর লুটপাটতন্ত্র বুঝতে অক্ষম। প্রশ্ন হচ্ছে কেন কৃষক বন্যা, খরা, দৈব-দুর্বিপাকে ফসলহানির ঝুঁকি নিয়েও ফসল ফলায়? কেন তাঁরা বছরের পর বছর লোকসান দিয়েও কৃষিকাজ করে? কারণ, কৃষি তাদের কাছে মুনাফা না, কৃষি তাদের জীবনধর্ম।

একটা গল্প মনে পড়ে যায়

প্রথম শ্রেণির ছাত্র ভোলারামের আঙুল চোষার রোগ। মা-বাবা হোমিও, অ্যালো, টোটকা, কবিরাজি সব সেরে হয়রান। কিছুতেই ভোলার মুখ থেকে আঙুল বেশিক্ষণ বাইরে রাখা যায় না। ভোলার এক মামা ছিলেন। সব দেখে তিনি সহজ বুদ্ধি দিলেন। বললেন, 'দাও ওর প্যান্টগুলো ঢিলা করে।'

এরপর হলো কী– পরলেই প্যান্ট কোমর থেকে যেই না খসে পড়ে, অমনি ভোলা দুই হাত দিয়ে প্যান্ট ধরে তুলে রাখে। এমনি করেই বেচারা দৌড়াদৌড়ি করে, খেলাধুলা করে, স্কুলে যায়। বাবা-মা, স্কুলের শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব সবাই বেজায় খুশি। সবাই শিখল, প্যান্ট খসে গিয়ে নাঙ্গা হওয়ার ভয় না পেলে কেউ আঙুল চোষা বন্ধ করে না।

যে জাতি আঙুল চোষার নেশায় আসক্ত, তাদের ভোলারামের মতো পরনের কাপড় খসে পড়লেও আঙুল চোষা আর বন্ধ হবে না। সমস্যা হলো, খেলারামরা মাঠের দখল নিয়ে নিলে ভোলারামরা আঙুল না চুষে আর কী করতে পারে? আমাদের দেশে কৃষকের অবস্থা হয়েছে ওই ভোলারামের মতই, এক হাতে কাপড় সামলায় তো আরেক হাতে ফসল ফলায়।■

● সহকারী কর্মকর্তা-কৃষি

তথ্য সূত্র: 45 years Agriculture Statistics of Major Crops (BBS,2018) and Yearbook of Agricultural Statistics-2019, 31st Series ও দৈনিক প্রথম আলো।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ■ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মো. আরিফুর রহমান

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এমন ধরনের উন্নয়ন যা জনগণের জন্য কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক সুযোগই তৈরি করে না, বরং এ প্রক্রিয়ায় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য তৈরি সুযোগগুলোতে সবার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন সমাজের সমস্ত স্তরে দারিদ্র্যতা হ্রাস ও অধিকার নিশ্চিতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বে প্রতিদিনই অনেক জনগোষ্ঠী লিঙ্গ, জাতি, বয়স, প্রতিবন্ধতা বা দারিদ্র্যতার কারণে মূলস্রোতধারায় অংশগ্রহণ ও বিকাশ থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল উপজীব্য কৌশল হলো সমাজের কাউকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রত্যেককে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য তিনটি শর্তাবলী ও এর মধ্যে সুসমন্বয় অত্যন্ত আবশ্যক। এগুলো হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায় যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। অর্থাৎ দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিসেবাসমূহে প্রবেশাধিকার থাকে। এর মধ্যে রয়েছে সমান সুযোগ প্রদান, শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষমতায়িত করা। এই ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক ও টেকসই উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্য কথায়, গতানুগতিক মডেলগুলির মতো কেবল অর্থনৈতিক ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সাম্যতার সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির দিকে বেশি মনোনিবেশ করা। অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এবং বিকাশ সম্পূর্ণরূপে সহজতর করে। যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি ও প্রতিবেশ-এ কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। সঙ্গতকারণে আমাদের মত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরী।

টেকসই উন্নয়ন কথাটা প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে, ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন এর রিপোর্টে। ২০০০ সালে শুরু হওয়া 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এরপর জাতিসংঘ ২০১৫ সালে (২০১৬-২০৩০) মেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব রক্ষা এবং একটি নতুন টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা হিসেবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। যা 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, এসডিজি বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকেই প্রতিস্থাপিত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা হলো:

এসডিজি : ১ দারিদ্র্য নিরসন (সকল পর্যায়ে সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান)। এসডিজি : ২ ক্ষুধা মুক্তি (ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নততর পুষ্টিমান অর্জন এবং স্থায়িত্বশীল কৃষি সম্প্রসারণ)। এসডিজি : ৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (সকল বয়সী, সকল মানুষের সুস্থ জীবন ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ)। এসডিজি : ৪ মানসম্পন্ন শিক্ষা (ন্যায়ভিত্তিক ও সমন্বিত সমমানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি)। এসডিজি : ৫ নারী পুরুষের সমতা (নারী পুরুষের সমতা অর্জন ও সকল মেয়েশিশুর ক্ষমতায়ন)। এসডিজি : ৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা (সবার জন্য পানি ও পয়ঃব্যবস্থার প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ)। এসডিজি : ৭ সবার জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানী (মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি-শক্তিতে সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ)। এসডিজি : ৮ মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি (সবার জন্য

সমন্বিত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি , সার্বিক ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজের সুযোগ তৈরী)। এসডিজি : ৯ শিল্প, অবকাঠামো ও উদ্ভাবন (টেকসই অবকাঠামো বিনির্মাণ, সমন্বিত ও টেকসই শিল্পায়ন উন্নীতকরণ এবং নতুন উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ)। এসডিজি : ১০ অসমতা হ্রাস (অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশীয় অসমতা হ্রাস)। এসডিজি : ১১ নিরাপদ শহর ও জনবসতি (শহর ও জনবসতিকে সমন্বিত উপায়ে নিরাপদ ও স্থায়িত্বশীল করা)। এসডিজি : ১২ দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ)। এসডিজি : ১৩ জলবায়ু (জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ)। এসডিজি : ১৪ জলজ সম্পদ সংরক্ষণ (স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য মহাসমুদ্র, সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার)। এসডিজি : ১৫ বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা (স্থলজ বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা , পুনঃস্থাপন ও এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পরিবেশবান্ধব বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রতিরোধ, এবং ভূমি ক্ষয় ও রহিতকরণ প্রাণবৈচিত্র সুরক্ষা)। এসডিজি : ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা (স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ)। এসডিজি ঢ় ১৭ উন্নয়ন ও অংশীদারীত্ব (স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারীত্ব পুনঃসক্রিয়করণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়া জোরদারকরণ)।

জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশন্স নেটওয়ার্কের এসডিজি সূচক এবং ড্যাশ বোর্ডস রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী, ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১১তম। সবদিক মিলে বাংলাদেশের স্কোর ৫৯ দশমিক ৩। ২০১৭ সালে এর অবস্থান ও স্কোর ছিলো যথাক্রমে ১২০ ও ৫৬ দশমিক ২। শুধু ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান বাদে দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল, ভুটান র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট এর পর্যালোচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ এমডিজির ৮টি লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে পূরণ করলেও এসডিজির ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮টি তেই বাংলাদেশ এখনো সফল হতে পারেনি। বর্তমানে বাংলাদেশ যে ৮টি টেকসই লক্ষ্যমাত্রায় প্রত্যাশার তুলনায় পিছিয়ে আছে, সেগুলো হলো- এসডিজি : ২, এসডিজি : ৩, এসডিজি : ৭, এসডিজি : ৯, এসডিজি– ১১, এসডিজি : ১৪, এসডিজি : ১৬। এসডিজি : ১৭। বাংলাদেশের এই সফলতাকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পৌঁছতে দরিদ্র মানুষের টেকসই দারিদ্র বিমোচন এবং তৎপরবর্তী আর্থ সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা সামগ্রিক উন্নয়ন আবশ্যক। সরকার ও এনজিওসমূহ সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন অন্তর্ভূক্তিমূলক সামাজিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ উন্নয়নে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

এনজিওসমূহ তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কার্যক্রমে তাদের পরিচালিত সমিতি বা গ্রুপে প্রতিবন্ধী , নৃতাত্ত্বিক, প্রবীণ, তৃতীয় লিঙ্গ, জেলে, হরিজন, তাঁতী, কামার, কুমার, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্ন্তভুক্তিমুলক উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে। এই কর্মসূচিতে উপরোক্ত ব্যক্তিদের জন্য বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে যাতে দেশের সকল অঞ্চলের (সমতল, পাহাড়, চর, হাওড়, উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চল)

ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। সংশ্লিষ্ট লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য এসব অঞ্চলের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য ও যথাযথ দক্ষতা প্রদান, বাজার ও ব্যবসা উন্নয়ন কৌশল, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি উপকরণ প্রদান, প্রযোজ্য কারিগরী দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালন প্রশিক্ষণ, গরু-ছাগল পালন, কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হবে। প্রশিক্ষণের পর স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ সুবিধা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী করে তোলা যেতে পারে। যাতে তারা নিজেরা স্ব-নির্ভর হয়ে আর্থিক উন্নয়ন করতে পারে এবং সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সেবা আদায়ে সংগঠিত ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি দ্বারা লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দৈনন্দিন জীবনে সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমাজে অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

এখন হতেই টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বা রূপকল্প ২০৪১'র সঠিক বাস্তবায়নে ও সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিও সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নয়ন বান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। জাতির পিতার স্বপ্নের অনুসারী হিসেবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে তাঁর স্বপ্ন-চিন্তাকে সর্বজনের সাথী করা। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনায়, জননীতিতে এর প্রতিফলন থাকতে হবে। কেননা ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি যেভাবে দুই দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে শুধু বৈষম্য বাড়ছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য বহুমাত্রিক কর্মসূচী আমাদের দেশীয় প্রাঙ্গণে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশা অনেকাংশেই পূরণ সম্ভব হবে।■

● লেখক : গবেষক ও উন্নয়ন সংগঠক
নির্বাহী পরিচালক, ইপসা

প্রত্যয় সাহিত্য

কবিতা

একটি অমিয় নাম
আবদুস সাত্তার

একটি অমিয় নাম কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিদিন সকাল-বিকাল
নক্ষত্রের মতো জ্বলে, জ্বলজ্বলে গগনের কোণে মহাকাল
সে নামে মানুষ জাগে, পাখি জাগে, ফুল তার বিলায় সুবাস
সে নামে নদীরা জাগে, নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙে কবি পায় ছন্দ-অনুপ্রাস
সে নামে প্রগাঢ় হয় পৃথিবীর মানুষের স্বপ্ন-সাধ, আশা-ভালোবাসা
ভীরুতা পালিয়ে যায় তারুণ্য-জোয়ারে কণ্ঠে জাগে প্রতিবাদী ভাষা
সে নাম আমার নাম, জাতির বিশুদ্ধ নাম, বাঙালির আত্ম-পরিচয়
প্রবল সাহস হয়ে সে নাম নিয়ত দানে চেতনায় দৃপ্ত বরাভয়
সে নামে সুধীরে বয় হতাশার মরুভূমে শান্তিময় স্নিগ্ধ সুবাতাস
সে নামে বৃষ্টি ঝরে রবীন্দ্র-গীত-সুরে মনে হয় বাউল উদাস।

অমিয় একটি নাম চেতনায় ঢেউ তোলে, রুধিরে জাগায় আলোড়ন
সে নামে প্রাণের সাড়া, মৃত ঘাসে জেগে ওঠে উদ্দাম সজীব যৌবন।
সে নামে সতত ভীত মদমত্ত স্বৈরাচার, গর্বোদ্ধত আস্ফালনকারী
ধুলায় লুটিয়ে পড়ে রাইফেল, স্টেন আর এজিদের তীক্ষ্ণ-তরবারি
সে নামে প্রকম্পিত মুহূর্তে রাজপথ, জনপদ, গোটা রাজধানী
সে নামে জনতা হয় ঐক্যবদ্ধ, ভুলে যায় ভেদাভেদ, তুচ্ছ হানাহানি
সে নাম পাথেয় করে কোটিপ্রাণ একসাথে ধমনীতে পায় নব সাড়া
সে নামে চোখের কোণে আচানক দেখা দেয় প্রণয়ের স্বচ্ছ অশ্রুধারা
সে নামে আহুতি দেয় বাংলার সন্তানেরা টগবগে লক্ষ তাজা-প্রাণ
আমার শাশ্বত গর্ব সেই নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কবিতার জন্য
আসাদ মান্নান

একটি কবিতা লিখবো বলে গতরাত থেকে
জেগে আছি
আমার প্রাণের সঙ্গে মিশে থাকা
এই আলোকিত বন্দর নগরে;
কিন্তু সেই প্রিয় শব্দগুলো
চিত্রকল্প উপমার চিহ্নমালা
আব্রুহীন অন্ধকার
কোথাও দেখছি না আর--
অথচ ওরাই ছিলো সারাক্ষণ আমার একান্ত অনুগত
যখন যেভাবে যাকে উঠে আসতে হুকুম দিয়েছি
তৎক্ষনাৎ দলে দলে কবিতায় উঠে আসে।
এখন আসে না কেন, তবে আমি কি নিস্তেজ হয়ে
শূন্যতার জায়নামাজে সেজদা দিয়ে পড়ে আছি?

সময় আসলে এক ধাবমান শিকারির নাম
যার কাছে মূল্যহীন অপেক্ষার দাম।
আমার হলো না আর এ শহরে খুঁজে পাওয়া
হারানো আমাকে কিংবা প্রিয় কোনো
কবিতার দুরন্ত যৌবন।

সূর্যাস্ত
কমল চক্রবর্তী

বেঁটে মানুষদের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
সূর্যাস্ত আসন্ন, অন্ধকার।
লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রান্তরে একাকী দুর্মর।

উনি জানতেন, এরা এত বেঁটে,
নিজেদের দীর্ঘ ছায়া
ঘুরে ঘুরে দেখে, মেলায় মজলিসে মাতে
ছবি তুলে, বিলোয় দপ্তরে,
ডাকাতিয়া লম্ফ দিয়ে, ভল্ল তোলে
অকস্মাৎ রে... রে...।

উনি জানতেন, এরা ছিঁড়ে ফেলবে, চন্দ্রভূখ বর্ণপরিচয়
কুটিকুটি, নারী লজ্জা, নারী জানলা, নারী ক্ষেত্রফল
ভেঙে ফেলবে বিদ্যালয় গুন ভাগ, অঙ্কে গোঁজামিল
আরও ভাঙবে ভোরের মাদোল।

তবু বেঁটে রাজা, বেঁটে মন্ত্রী, বেঁটে বেঁটে
পাত্রমিত্র আমাত্তের গলায় পরালেন
শ্বেতকুন্দ, পারিজাত মালা।

তিনি তো ভুবন ছেঁচে অর্চনা এনেছেন
দ্রৌপদীর-থালা।

নীলের ডুমুর
শাহীন রেজা

হাতের মুঠোয় জল ধরে রাখা যায়না; আমিও পারিনি
পিপাসায় একটা আস্ত রাত গিলেও আমার তৃষ্ণা মেটেনি।
কলম্বাস জলের পাহারা ভেদ করে যেদিন
আমেরিকা আবিষ্কার করলেন সেদিন তিনি
জল নয় ল্যান্ড-ল্যান্ড বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন।
ডুবোচরের কাদামাটি কখনো শ্যাওলার ভূমি হয়না,
কৃষ্ণগহ্বরের বুক চিরে বেরিয়ে আসা ফুলকি হাউই হলে
পৃথিবী বেঁচে থাকে অন্ধকারের আবাদ হয়েই।
আমার একহাত যদি জলের খেলনা হয় তবে বাকি হাতে
আমি এঁকে ফেলি তোমার অধর।
চুম্বন বৃক্ষের কাছে পরাজিত রাতে ফুটে ওঠা নীলের ডুমুর
আমাকে নাচায়, আমাকে ভেজায়।

দুবাহুতে মৃত্যুর ঘ্রাণ
আমীরুল আরহাম

দমদমে সেদিন প্লেনের শব্দে নয়
শরণার্থীর চিৎকারে ছিল আকাশ থমথম
মৃত্যুর মিছিলে বেঁচেছে যারা মরছে কলেরায়
শবের গন্ধ ঢেকে কর্পূর আগরবাতি লোবান
মৃদু নিওনের আলোয় গন্ধ ফিনাইন
ট্রানজিস্টর রেডিও ঘিরে আতঙ্কিত নারী পুরুষ
একটি ফুলকে বাঁচাবে বলে যুদ্ধ করছে মুক্তিযোদ্ধা বীর
চরমপত্রে পাকি সেনার পতন দেখে ওরা হাসিতে লুটায়
ফ্ল্যাগ হাতে শিশুরা জয়বাংলা তুলে তাড়াচ্ছে পাক হানাদার
হাসি-কান্নায় কাদামাটি আলোছায়া জীবনমৃত্যু খেলা।

ওদেরই একজনের নিঃসাড় হাত খোসে পড়ে গেলো ছেঁড়া বল।
যুদ্ধে গেছে বাবা, মরেছে মা সদ্য কলেরায়
ছেলেটিও যাবে মার কাছে
বোনের কোলে মাথা পেতে দিলো
একমাত্র ছোটভাই ধরেছে যম কলেরায়।
দুবোনের চিৎকারে মুসল বৃষ্টিতে ভরে উঠেছে বনগাঁ রোড
থেকে থেকে থেমে যাচ্ছে গাড়ির চাকা
দাঁড়ানো একটা ট্রাকে
কোলে ভাইটি নিয়ে দুই বোন সহ আমরা পাঁচজন
ট্রাকের ড্রাইভার যেনো কতো কালের একান্ত আপন।
রাস্তার দুধারে মাইকে, ঝনঝনিয়ে টিনের কৌটায় আহ্বান-
"প্রতিবেশী শরণার্থী, আত্মজ আমাদের-
যে যা পারেন সাহায্য করুন,
অর্থ দিয়ে, কাপড় দিয়ে, পয়েন্ট টু টু কার্টিজ দিয়ে
এগিয়ে আসুন"।
জলের ভেতর দিয়ে ছুটছে ট্রাক
দমদম ক্যাম্পের অকথিত অজস্র কাহিনীর তুচ্ছ একটা জীবন।
আমরা মুখোমুখি 'আরজিকর হাসপাতালে' যখন
ভাইটি মাথা রেখে দিলো আমাদের আমগ্ন ভিজে চোখের পাতায়।
সেদিন দুই বোন শুধু নয়
আমরা সবাই হারিয়েছিলাম আমাদের ছোট ভাই।
কাকের চিৎকার, কলকাতার বুকফাটা আর্তনাদ
আজো মিশে আছে 'আরজিকরে'র প্রবেশ পথে
আজো এই ঊনপঞ্চাশে লেগে আছে দুবাহুতে আমার
আমাদের প্রিয় ভাইটির সেই মৃত্যুর ঘ্রাণ।

জয়তু ঘারিন্দা
আইউব সৈয়দ

ফাগুনের ভোরে পলাশ ফুলের ঘ্রাণে কুয়াশারা খেলা করে
স্মৃতির হাওয়া চিরে এক ঝাঁক ভেজা হু হু অনুভূতি ডালে ডালে মাতোয়ারা।
শেকড়ের টানে আগমনী শিস্ বুঝি মিনতি জানায় ;
অপৌরুষেয় নয় বসন্ত– অনুরণিত চোখে সামিল হয়েছে ঐ।

স্বাপ্নিক প্রতিবেশী কোকিলরা সিদ্ধান্তময় সুরে অজান্তে ডাকছে ,
দশদিক উজ্জীবিত হয়ে বৈভব কণ্ঠে তাকিয়ে থাকে ইতিউতি ।
স্বপ্নরঞ্জিত বিনিময়ে ছড়ায় দূরত্বেরই রঙ বেরঙ মুগ্ধতা–
শ্রুতিহীন কিছু অন্ধকার সরিয়ে কণ্ঠশীলনেতে আঁজন আঁকে ।

বিভাজন বিন্দু ছেড়ে ভিনবাসে মজেছে মায়ারূপের জানাশোনা,
স্থাবর– অস্থাবর সকাল চন মনে জেগে উঠে সবুজ দর্শনে–
পুরোদস্তুর নাগরিক আশ্রয়ে লুকিয়ে ফেলেছে বিবর্ণ পাপড়ি ,
জাতিভেদ ভুলে আগলে রেখেছে কথোপকথনের এক প্রকৃতি ।

অম্বভাবী মনোলোক বলে কিছু নেই, শ্যামল ঝঙ্কার লেগে আছে
কাঁচা আভার বীজরোপণের মতো– জয়তু আনন্দময়ী 'ঘারিন্দা'।

নতুন রোদের গল্প
শফিক ইমতিয়াজ

গাঢ় হোক যতই প্রতিটি অন্ধকার, বুকে তার গুপ্ত ক্যালেন্ডার
আর তাতে লাল দাগে চিহ্ন করা ফুল ফোটার তারিখ;
সূর্যালোকে দৃশ্যমান হবার আগেই
বাতাস, রহস্যবুকে বয়ে বেড়ায় সে ফুলের জন্মবার্তা।

অসীম মানুষ শ্রমঘামে বেয়ে যায় মৃত্যুময় উজান
রক্তাক্ত হতে হতেই বেয়ে ওঠে পাষান পাহাড়
নিস্পন্দ জনজঙ্গম জেগে উঠে' দুঃসাহসে তাড়া করে
হিংস্র থাবার মানুষখেকো বাঘ
খুলে যায় বৈরীবন্ধ, কাকলীবনের অবরুদ্ধ
পৃথিবী অবাক দ্যাখে, শ্যামলা-ঝড়ে পর্যুদস্ত মেঘের বিদীর্ণ!

উঠোনে তখন নতুন রোদের গল্প
বারুদপোড়া শহরে কী তুমুল কোলাহল আর নিরুদ্বেগ বিকিকিনি!
জুলিকাটা বাতর পেরিয়ে দুর্বাদলে মেশে হাঁসের রাঙা পা
পাশেই স্বপ্নফসল, দুধালি আমনধানে কিশোরীর শিহরিত হাত!

আমারে চিনিস আমি কিডা
কবীর হোসেন তাপস

তুই সত্যি করে কতি পারিস বুজান
আমি কিডা?
কী আমার পরিচয়। হাটে গঞ্জে মাঠে যার
সাথে দেখা হয় সে-ই দেকি কয়
'তুই আমারে চিনিস? আমি কিডা
জানিস? আমার সাথে লাগতি আসবি
তো জানে মরিছিস!' কে যে কিডা আর
কে যে কিডা না, ভাবতি ভাবতি আমার
আলু পটল মরিচ তরকারী সব লুটে পুটে
খ্যালো। আমি আজ অব্দি কারেও পাল্টা কতি
পারলাম না যে এই আমি কিডা! একবার
রাগের তোড়ে কইছিলাম আমারে চিনিস
আমি কিডা?
সবাই হি হি হি করে হাসতি লাগলো, বুঝলাম এই
বাপে কাজ হবেনানে– আরো বড় বাপ
লাগবি। বুজান বড় বাপ কনে পাব?
একবার যদি পাতাম– এর ওর আলুটা মুলাটা ফ্রি
খাতাম। আর লাগতি আসলি
বুক ফুলায়ে কতাম আমারে চিনিস আমি কিডা?

রাজু আক্তার
কাজী জহিরুল ইসলাম
(নেত্রকোনার বীরাঙ্গনা রাজু আক্তারের জন্য)

পুষ্প বিকশিত হয়নি তখনও, সবে তো দিয়েছে
উঁকি; আলো-ছায়া লুকোচুরি, ভোরের বাতাসে দোলে
অনাঘ্রাতা কলি। উত্তপ্ত দুপুর খুঁজে পেয়ে গেছে
শিকারের ঘ্রাণ, সম্ভ্রমের গোপন দরোজা খোলে
উর্দি পরা একদল বুভুক্ষু বরাহ। ঝাঁপ দেয়
নিস্তরঙ্গ জলে। তছনছ করে শাপলা-শালুক।
বরাহ-সঙ্গী স্বদেশী কিছু অতি ধূর্ত সারমেয়
গোপন সার্থের মোহে তুলে দেয় নিজের মুলুক।

নেত্রকোনার অভাগী বধূ রাজু আক্তার সম্ভ্রম
হারিয়ে অপয়া, অপাংক্তেয় উনিশ'শ একাত্তরে
ভঙ্গুর আত্মবিশ্বাস, ছাই নারীর আত্মঅহম।
এই দেশ, এই মাটি তাকে তোলেনি নিজের ঘরে
আর কোনোদিন। স্বপ্নের আকাশে ঘোর অন্ধকার,
জীবন সায়াহ্নে বীরমাতা নিস্প্রভ রাজু-আক্তার।

প্রদীপ নিভিয়ে দাও

ফারুক আফিনদী

ঘুম– ছুটে যায়
প্রদীপ নিভিয়ে দাও
হাতটা ওঠাও একটু
ঢেউ দেখনি?
শীতল বাতাস?

প্রদীপ নিভিয়ে দাও
মেরিন ড্রাইভে
মেঘনায়–পদ্মায়–যমুনায়
তেঁতুলিয়ার নিসর্গ জুড়ে

একটু পেছনে এসো
একটু ডাইনে– বায়ে–
গুল্ম-বৃক্ষভরা পাহাড়ের কোলে
আরও পিছে– হেলেঞ্চা ভরা
ঠাণ্ডা ছোট ছোট খালে–গাঙকুলে

দাঁড়াও– হাতটা ওঠাও একটু
বাতাসের ঢেউ যেমন
সমুদ্রের– নদীর বাতাস– জলার–

প্রদীপ নিভিয়ে দাও
নরম অন্ধকারে ঘুমাব
উষ্ণ কিংবা ঠাণ্ডা ঘুম

রক্তের মিছিল

আহ্‌মেদ জুয়েল

আজকাল বড় বেশি কাটছে বিনিদ্র রাত
প্রায়শঃই নির্ঘুম রাত।
ঘুমুতে গেলেই চারিদিকে শুধু
মিছিলের শব্দ শুনি– প্রচন্ড শব্দে
কিছুতেই ঘুমুতে পারি না।
নির্ঘুম চোখ নিয়ে জেগে থেকে থেকে
ভাবনার মধ্যেই যোগ দেই মিছিলে।
এ যেন অন্য রকম এক মিছিল
স্লোগানে- স্লোগানে আর্তনাদের সুর
সাথে তীব্র প্রতিবাদ আর
দাবী আদায়ের অনঢ় অভিব্যক্তি।
ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা কিংবা পুনরুদ্ধারের
তথাকথিত কোনো রাজনৈতিক মিছিল নয়
পরীক্ষা পিছানো কিংবা ক্লাশ বর্জনের
হাস্যকর ছাত্র-আন্দোলনের মিছিলও নয়,
কি আশ্চর্য! শুধু রক্তের মিছিল,
অগণতি মানুষের সমবেত রক্তের মিছিল।
বায়ান্ন একাত্তর নব্বইয়ের রক্তধারা মিছিলে মিছিলে
কেড়ে নিচ্ছে গণতন্ত্রকামী মানুষের ঘুম।

মৃৎময় মানবিক বোধ

রওশন রুবী

একদিন মখমল হয়ে উঠবে এই সব মাটি,
আর শিল্পীরা মখমলে ছড়াবে তাঁদের পুরাণ দিনের মতো
গোপন বিলাস। আমি কৈশোরের সেই
আমাকে নিয়ে আল ধরে হেঁটে যাবো–
মৃৎপাড়ায় শিল্পীরা
স্বপ্ন পোড়ালে যে মেঠো গন্ধটুকু উঠে আসে
তা শুঁকে নিতে।

আহ! পরান পোড়া দগদগে গন্ধ, আহ! সারি সারি স্বপ্নের টেরাকোটা।

কৈশোরে মৃৎপাড়ার বাসিন্দা হতে চেয়েছিলাম,
চেয়েছিলাম মৃৎশিল্পীর ঘামার্ত কাদায় মাখা শত কষ্ট
লেহন করা মুখ। কতোদিন স্কুল পালিয়ে ছুঁয়ে গেছি মৃৎপাড়া,
মুগ্ধতা রেখে গেছি শাঁখা সিঁদুর রমণীদের কোমল মনে।

পারিনি কখনোই। কি ভীষণ যন্ত্রণা রোজ রোজ প্রতিহত করে
এটুকু বলতে, বলতে চেয়েও থমকে গেছি– মাটি মেখে
বেঁচে থাকার মধ্যে যে সুখ সে আমার অট্টালিকায় মেলেনি।
তাই স্বপ্নের আবাস ভূমি বড় ফাঁকা, এই ফাঁকা আবাস দেখলেই
বাসনারা ফালি ফালি করে সব অবসর,
খণ্ডিত হয় পৌরাণিক ইচ্ছের যতো তৈজসপত্র।

আজও পুব আকাশে সোনালি আলো বিচ্যুরিত হলে
ছুটে যাবার টানে মনটা খাঁ খাঁ করে,
ইচ্ছে করে ভোঁকাট্টা ঘুড়ি হয়ে আমার সেই
মোহন শাঁখা পলার শব্দ গহনে বেঁচে থাকা প্রতিটি প্রাপ্তির মতো
কণ্টকহীন শিল্পগুলো ছুঁয়ে আসি, ছুঁয়ে আসি সরল মানুষ।

ইচ্ছে সিঁড়ির যে ধাপগুলো কিছুদিন আগেও বরষায় ছিলো টলটলে ,
কারো পদধ্বনি শুনবার তীব্রতা ছিলো ঈশা খাঁ'র
তলোয়ারের মতো সুতীক্ষ্ণ।
অনর্গল উঠে আসা সেই সিঁড়ি ছুঁলে মনে হয়
এই পথটুকু পেরুলেই মৃৎশিল্পীদের ক্ষীণ আলো ঘর।

শুধু এক ছুট, শুধুই এক ছুট, তারপর আমি ফের একমুঠো
কাদা থেকে জন্মানো মানব। আমার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
অবগুণ্ঠন আর কঠিন বলয় সব তছনছ, আর সব শিল্পকর্মগুলো
শত শত বছর পুরানো ময়নামতির গহিন থেকে তুলে আনা
ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিকৃত অথচ অমূল্য সম্পদ।

ছোটগল্প

শেষ

স্রোতধারা

ফরিদুর রহমান

আমার বয়স বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমান। ১৯৯০ সালে আমি যখন প্রথমবারের মতো দেশে আসি তখন আমার বয়স ছিল উনিশ বছর। এই বয়সের একটি মেয়ে, যে পাঁচ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে গেছে, মা তাকে একা ছাড়তে রাজি হননি। তারপরেও বয়স আঠারো বছর পার হবার পর থেকেই একবার বাংলাদেশে আসার জন্যে জিদ ধরেছিলাম। আত্মীয় স্বজন বলতে ঢাকায় মামারা ছাড়া দেশে তেমন কেউ নেই। তবে কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত এক চরে আছেন আত্মীয়ের চেয়ে বড় পরমাত্মীয়, বাবার বন্ধু– সহযোদ্ধা তোফাজ্জল মাস্টার, আমার তোফা চাচা।

এবারে ছাব্বিশ বছর পরে কুড়িগ্রামে এসেছি। চিলমারি থেকে দুপুরের পরপরই একটা ট্রলারে উঠে বসেছিলাম। আমি ভেবে অবাক হই, নেভিগেশনের কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি, এমন কি একটা সাধারণ কম্পাস ছাড়া ইঞ্জিন লাগানো কাঠের নৌকায় এই বিস্তৃত নদী পাড়ি দিয়ে মাঝি মাল্লারা ঠিকঠাক গন্তব্যে পৌঁছে যায় কেমন করে! দেশের উত্তরাঞ্চলে শীত পড়তে শুরু করেছে বলে নদীতে জলের প্রবাহ অনেক কমে গেছে। তারপরেও ঘণ্টা খানেকের পথ পাড়ি দেবার পরে কূল কিনারা চোখে পড়ে না। নেদারল্যান্ডসে গত কুড়ি বছর ধরেই একটা নদীর ধারে আমার বসবাস। আসলে আমস্টারডাম শহরটাই গড়ে উঠেছে আমস্টেল নদীর তীরে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেবার সময় বোঝা যায় নদী কাকে বলে! নদ বা নদী যাই বলি না কেন ব্রহ্মপুত্রের সাথে আমস্টেলের কোনো তুলনা চলে না। একত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ আর শ দেড়েক মিটার চওড়া বয়ে যাওয়া জলস্রোত আমস্টেলকে খাল বললেও বেশি বলা হয়।

মাঝে ২০০১ সালে কয়েকদিনের জন্যে ঢাকায় এসেছিলাম, কিন্তু প্রবল ইচ্ছে থাকলেও চর নারায়ণপুর যাওয়া সম্ভব হয়নি। তোফাজ্জল চাচার সাথে কথাবার্তা যা হবার ঢাকাতেই হয়েছিল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেশে এসে যে পরিবর্তন লক্ষ করছি, তা আমাকে রীতিমতো বিস্মিত করেছে। ট্রলারের যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের বেশ কয়েকজন নারী থাকলেও তাদের কারো চেহারাই আমি পুরোপুরি দেখতে পাইনি। আমার খুব কাছেই বসেছে দুজন কিশোরী। তাদের সাথে আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কথা বেশি দূর এগোয়নি। পুরুষ যাত্রীদের দুই একজন অবশ্য জানতে চেয়েছেন, কোত্থেকে এসেছি, কোথায় যাবো ইত্যাদি! গতবারে বাংলাদেশে বসবাসের পুরোটা সময় আমি জিনস টি-শার্ট পরে কাটিয়েছি। এবারে সালোয়ার কামিজ, বিশেষ করে ওড়না ব্যবহারের অভ্যাস না থাকলেও তোফা চাচার নির্দেশনা অনুসারে আমি পোশাকেও বাঙালি শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। তারপরেও ওরা আমাকে কী ভেবেছে কে জানে!

নদীর বিস্তার যেখানে কম সেখানে দু পাড়ের দৃশ্য ঘন ঘন বদলাতে থাকে। কোথাও খাড়া পাড় থেকে বড় আকারের ভূমিখণ্ড ঝুপ ঝাপ করে ভেঙে পড়ছে, কোথাও ক্ষেতের প্রান্তে এসে পড়া নদীর গ্রাস থেকে ভূমি রক্ষার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চলছে আবার কোথাও একদল মানুষ ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ঘর থেকে বাঁশের খুঁটি, টিনের চাল, ছনের বেড়া, কাঠের দরজা জানালা খুলে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে। বাড়ির মেয়ে বউরা গুছিয়ে নিচ্ছে থালা-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল। গলায় দড়ি বেধে একটা অনিচ্ছুক ছাগলকে টেনে হিঁচড়ে সীমানার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এক কিশোরী। আমি ভাঙনের এইসব বিপর্যয়ের পাশাপাশি দুই চোখ মেলে শ্বেতশুভ্র কাশফুলের সৌন্দর্য দেখি। মাইলের পর মাইল জুড়ে বাতাসের দোলায় ঢেউয়ের মতো দুলতে থাকা কাশবন নদীর বাঁক বদলের সাথে সাথে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায়।

প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন বয়স এবং ভয়-ডর দুটোই কম ছিল। শেষ বিকেলে ঘাটে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন বোট বিট বিট শব্দ তুলে কিছু দূর যাবার পরে নদীর একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য ডুবে গেলে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। আমাকে যিনি নিতে আসার কথা তিনি তখনও এসে পৌঁছাননি। তোফাজ্জল মাস্টার, মা বলেন তোফা ভাই– গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন আর মাঝে মাঝে কুড়িগ্রামের একটা পত্রিকায় লেখালিখি করেন। তাঁকে কখনো দেখিনি, শুনেছি বাবার বন্ধু। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাবার সাথে একই ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে রৌমারি রাজীবপুর এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ শেষে ক্যাম্পে এবং দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশে ফিরে এলেও বাবা আর কখনোই ফিরে আসেননি।

তোফাজ্জল চাচার চেহারা পরিচিত না হলেও যেমনটা শুনেছিলাম তেমনই একটা পরিচিত মুখ খুঁজছিলাম আমি। হয়তো কোনো কারণে দেরি হচ্ছিল তাঁর। অস্থায়ী ঘাটে জিজ্ঞেস করার মতো কোনো লোকজনও নেই। চিলামারি থেকে আসা লোকজনের সাথে আমিও সামনে এগিয়ে যাবো কিনা ভাবছি, এ সময় প্রায় অস্তাচলে যাওয়া সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন তোফাজ্জল মাস্টার।

'তুমিই তো টায়রা? আমি একটু দেরি করে ফেললাম মা।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেছিলেন তোফা চাচা।

আমার নাম তায়রান, চাচা সেটাই টায়রা করে ফেলেছেন। তবে তাঁকে নামের ভুলটা আমি ধরিয়ে দিইনি। এবারে তিনি আগে থেকেই ঘাটের কিনারে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর বয়স বেড়েছে, এলোমেলো চুল এখন প্রায় সবই সাদা, শুধু কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা নেই, তার বদলে হাতে একটা ছাতা। ছাব্বিশ বছর তো কম সময় নয়। তবে বয়স সত্তুরের কাছাকাছি হলেও এখনও তাঁর শরীরের কাঠামো ঋজু, হাঁটা চলায় পদক্ষেপ দৃঢ় এবং কথা বার্তায় স্বতঃস্ফূর্ত । আমি মাটিতে পা রাখতেই লম্বা পা ফেলে তোফা চাচা এগিয়ে এলেন।

নিত্য নিয়মিত নদী ভাঙনের কারণে চর নারায়ণপুরে কোনো স্থায়ী ঘাট নেই। ঘন কাশবনের পাশে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় বাঁশের তৈরি মাচা আর দুই একটা খুঁটি ছাড়া ঘাটের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বন্যা খরা নদী ভাঙন এবং উজান থেকে আসা উপচে পড়া প্লাবনের সময় ঘন ঘন ঘাট বদলাতে থাকে। স্থানীয় মানুষ নদীর বাঁক বদলের মতো এই ঘন ঘন পরিবর্তনের সাথে ঠিকঠাক নিজেদের গন্তব্য খুঁজে বের করে নেয়। আমি দুদিনের জন্যে এসেছি, আমার এতো কিছু না ভাবলেও চলবে।

'মা টায়রা, আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো মা?'

'না চাচা, অনেক দিন পরে হলেও এবারে তো চেনা পথ। ঠিক চলে এসেছি।' আমার নাম নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছিল, তা আর ঠিক করে দেয়ার কোনো দরকার আছে বলে মনে হলো না।

'তোমার মা, শানু ভাবী কেমন আছেন?' মার সাথে চার দশকের বেশি সময় তোফাজ্জল চাচার দেখা নেই। তারপরেও শাহানা রশীদ তাঁর কাছে শানু ভাবী, কণ্ঠস্বরে সেই কোমল আন্তরিকতা।

আমরা নরম পলিমাটির পথ ধরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চাচার বাড়িতে পৌঁছে যাই। সেই পুরোনো আধাপাকা বাড়ি, টিনের চাল। চারিদিকে ঘিরে থাকা গাছপালা আগের চেয়ে অনেক ঘন, অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে। বাড়ির সামনের বাগানের বেড়া হয়তো খসে পড়েছে অনেক দিন আগেই। সন্ধ্যার আবছা আলোতেও বুঝতে পারি সযত্নে লাগানো ফুল গাছগুলোর জায়গা দখল করে নিয়েছে আগাছা আর নাম না জানা জংলা পুষ্পলতা। সময়ের ব্যবধানে সব কিছুই সম্ভব, কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হই, এতো কম সময়ে, মাত্র পাঁচ সাত মিনিট হেঁটে পৌঁছালাম কেমন করে। তোফা চাচা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আমি জিজ্ঞেস করার আগেই বললেন, 'নদী ভাঙতে ভাঙতে বাড়ির কাছে চলে এসেছে। এ বছর হয়তো টিকে যাবে, সামনের বছর বাড়ি সরিয়ে নিতে হবে।'

পাঁচ বছর বয়স থেকে ইওরোপে মানুষ হয়েও আমি চিরকালের বাঙালি খাবার খেতে পছন্দ করি। হয়তো সেটা আমার মায়ের রান্নার গুণে। এখন এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রান্না ছাড়াও দিব্যি নিজের সব কাজ নিজেই করেন। প্রথমবার যখন দেশে আসি, ঢাকায় মেজো মামা বলেছিলেন, 'তুই যে কুড়িগ্রামে যাচ্ছিস– কয়েকদিনে তো না খেয়ে মরে যাবি। গ্রেটার রংপুরের কোথাও কেউ ভালো রান্না জানে না।'

মেজো মামার কথা যে ঠিক নয়, বুঝেছিলাম চর নারায়ণপুরে এসে। মাত্র তিন দিন ছিলাম সেবার। কিন্তু ছাব্বিশ বছর আগে সালেহা চাচির রান্নার স্বাদ আমি এখনো ভুলিনি। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে সারাদিনের ক্লান্তি আর চাচির হাতের চমৎকার ঝাল ঝাল মুরগির মাংস দিয়ে ধোঁয়ওঠা গরম ভাত খাবার পরে আমার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রায় সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি। যে বাবার সাথে আমার কোনো স্মৃতি নেই, যাকে আমি কখনোই দেখিনি আমার মনে হয়েছিল পরদিন সকালে তাঁর সাথে আমার দেখা হবে।

প্রবহমান নদ-নদীর বিপুল জলরাশি ঘেরা জটিল ভূগোলের কারণে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় জুড়েই রৌমারী-রাজিবপুর ছিল মুক্তাঞ্চল। তারপরেও পাকিস্তানিরা ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাঝে মধ্যেই নৌ পথে এসে হানা দিয়েছে চরের স্বাধীন এলাকায়। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, নদী যখন কেবল পাড় ভাঙতে শুরু করেছে তেমনি এক দিন অপারেশন শেষে ফেরার পথে কোদালকাঠি চরের কাছে পাকিস্তানি গানবোট থেকে এলএমজির লাগাতার গুলি বর্ষণের সময় একটা গুলি সরাসরি এসে লেগেছিল বাবার কাঁধে। নৌকার কিনারে বসা বাবা সাথে সাথেই নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন। নদীর পানি অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল হয়ে গিয়েছিল বাবার রক্তে। সহযোদ্ধারা বাবাকে নৌকায় তুলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে নদীর বুকে নৌকার ভেতরেই বাবার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। সাতজন সহযোদ্ধার মধ্যে কেউ কেউ বাবার মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তোফাজ্জল চাচাসহ আমি যাদের কখনো দেখিনি সেই টুকু চাচা এবং জমির চাচা অনেকটা পথ উজানে এসে সেদিন সন্ধ্যায় চর নারায়ণপুরে বাবাকে সমাধিস্থ করেছিলেন। স্বাধীনতার দু বছর পরে সেই কবর তাঁরা ইট সিমেন্টে বাঁধিয়ে দিয়েছেন আর পরবর্তী সতের বছর ধরে অনেক যত্নে বাবার শেষ চিহ্নটুকু ধরে রেখেছেন।

প্রিয়জনের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো অথবা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া দরুদ পড়া, দুটোই আমার কাছে আনুষ্ঠানিকতা মনে হয়। তারপরেও প্রথমবার এসে খুব ভোরে উঠে তোফা চাচার বাগান থেকে তাজা ফুল তুলে অনেকটা পথ হেঁটে আমরা বাবার কবরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সাদা দেয়ালে পাথরের ফলকে লেখা ছিল, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। শহীদ বজলুর রশীদ। ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১।' আমার অচেনা অদেখা বাবার কবরের সবুজ ঘাস আর লতাগুল্মের ওপর আঁজলা ভরা ফুল ছড়িয়ে আমি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে মনে সুরা ফাতেহা পড়ার পরে আমাকে মোনাজাত করতে দেখে তোফা চাচার ছেলে বিপ্লব বিস্মিত হয়ে বলেছিল, 'তুমি দোয়া কালামও জানো টায়রা বু?' বিপ্লব আমার বছর দুয়েকের ছোট। ওর তো অবাক হবারই কথা। ও শুধু জানে আমি পাঁচ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে যাবার পরে আর কখনো আসিনি। কিন্তু কেউই জানে না, সামারে যখন দিনের দৈর্ঘ্য কুড়ি-একুশ ঘণ্টায় দাঁড়ায় রোজার দিন হলে আমার মা তখনও রোজা রাখেন।

সকালে ঘুম ভাঙলো সালেহা চাচির হাঁস মুরগির ডাকাডাকিতে। ভেবে রেখেছিলাম একটু দেরিতে হলেও সকালে বাবার কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াবো, তারপরে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারি স্কুলটা দেখতে যাবো। নাস্তার পরেও তোফা চাচার নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। চাচার শরীরটা কি খারাপ! বিপ্লব এখন স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঢাকায় থাকে, কাজেই ওকেও সাথে পাবার কোনো সুযোগ নেই।

'বজলু ভাইয়ের কবরটা তো আর নাই মা।' চাচা থেমে থেমে কথাটা বললেন, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'নেই মানে?'

'তোমরা দুঃখ পাবে বলে আগে জানাইনি। কবরটা কয়েক বছর আগেই নদী

ভেঙে নিয়ে গেছে।'

আমি অনেকটা সময় স্তব্ধ হয়ে থাকি। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের আমস্টেল নদীর তীর থেকে বারবার ফিরে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না, কিন্তু জানতাম কোনো এক দুর্গম চরের কোমল পলিমাটিতে আমার বাবা শুয়ে আছেন, যিনি জীবন দিয়েছেন তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্যে! ব্রহ্মপুত্রের চরভূমিতে আমার পূর্ব পুরুষের যে অস্তিত্বটুকু ছিল, তাও ভেঙে নিয়ে গেছে নদী। ফসলের জমি, বসতবাড়ি, স্কুল ঘর, হাট বাজার সবকিছুই নদীর ভাঙনে জলধারায় মিলিয়ে যায় বলে জানতাম। অসংখ্য সমৃদ্ধ জনপদ নদীর স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে জানা ছিল। কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতের টানে পরিচয়ের শেষ চিহ্নটুকুও ভেসে যেতে পারে তা আমার ভাবনায় কখনো আসেনি।

আমাকে অনেক্ষণ চুপচাপ দেখে তোফা চাচাই আবার বলেন, 'স্কুলটাও আগের জায়গায় নাই, নদী ভাঙার পরে প্রায় আধা মাইল দূরে সরিয়ে নিতে হয়েছে।' চাচা আমার কাছে এসে মাথায় হাত রাখেন। বলেন, 'স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত সরানো যায়, নতুন করে ঘর তোলা যায়, হাট বাজার বসানো যায়, কিন্তু কবর তো আর নতুন হয় না রে মা।'

বেলা একটু বাড়লে আমরা স্কুলের পথে রওনা দিলাম। একই চরের মধ্যে হলেও নৌকায় প্রায় পনের কুড়ি মিনিটের পথ পাড়ি দিতে হয়। ছোট একটা ডিঙি নৌকার পাটাতনে বসে আমি মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছুঁয়ে দিচ্ছিলাম। কূল কিনারাহীন নদ-নদী থেকে শুরু করে খাল বিলসহ সকল ছোট বড় জলধার একটার সাথে আরেকটা মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। এই স্রোতের ধারায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেই মিশেছিল আমার বাবার রক্ত আর এখন অস্তিত্বের পুরোটাই ভেসে গেছে নদীর পানিতে। নদীর টলটলে জলে হাত রেখে প্রত্যেকবারই আমার মনে হচ্ছিল আমি আবার বাবার শরীর স্পর্শ করছি।

ডিঙি নৌকাটা নিস্তরঙ্গ শাখা নদীতে তর তর করে বয়ে চলেছিল। এ নৌকায় বৈঠার ছপছপ ছাড়া কোনো যান্ত্রিক শব্দ নেই। তোফা চাচা পঁয়তাল্লিশ বছর আগের স্মৃতি চারণ করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা, বিশেষ করে বাবার কথা।

'বজলু ভাই ইউনিভার্সিটিতে আমার দুই বছরের সিনিয়ার ছিলেন, বিয়েও করেছিলেন ফাইনাল ইয়ারে থাকতেই... তারপরেই তো শুরু হলো যুদ্ধ। তোমার বাবার নাম ছিল বজলুর রশীদ খান... তোমাদের পারিবারিক পদবিই আর কী! আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান– এইগুলার উপরে বজলু ভাই আগে থেকেই খুব বিরক্ত। যুদ্ধ শুরু হলে– ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানদের নামের উপর থুতু দিই– বলে নিজের নাম থেকেই খান বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।' চাচা একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার নামটা কে রেখেছে মা? শানু ভাবী?' আমার নাম নিয়ে তোফাজ্জল চাচার বিভ্রান্তি দূর করার এই সুযোগটা আমি ছাড়তে চাইলাম না। বললাম, 'নামটা মা-ই রেখেছেন। আমার নাম আসলে তায়রান, তায়রান রশীদ।'

'তায়রান...' চাচা অন্তত বার তিনেক নামটা উচ্চারণ করার পরে বললেন, 'তায়রান শব্দের কি কোনো অর্থ আছে?'

'বয়ে যাওয়া নদীর জল, আরবি তায়রান বাংলায় বলতে পারেন স্রোতধারা। নানাজান চেয়েছিলেন নাতনির নাম রাখা হবে আরবি ভাষায়, আর মা চেয়েছিলেন তার মেয়ের নাম হবে প্রবহমান একটা কিছু, নদীর স্রোতের মতো।'

বজলুর রশীদের রক্তের বহমান স্রোতের ধারা তায়রান রশীদ।' তোফা চাচার কথা স্বগতোক্তির মতো শোনায়।

কিছু পরেই স্কুলে পৌঁছে দেখলাম বেড়ার ঘরের জায়গায় নতুন করে ইটের দেয়াল উঠেছে। সাইনবোর্ডটা পুরোনো হলেও পড়া যায়, 'শহীদ বজলুর রশীদ প্রাথমিক বিদ্যালয়'। আমার মায়ের রক্ত জল করা পরিশ্রমের অর্থে আর তোফাজ্জল চাচাসহ বাবার দু তিনজন মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর সাহায্য সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল এই স্কুল। তবে বিদ্যালয়ের বাইরের চেহারা দেখে যতোটা আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দেখে এবং তাদের সাথে কথা বলে হতাশ হলাম তারচেয়ে অনেক বেশি।

'স্কুলের ক্লাস শুরুর আগে এ্যাসেম্বিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় কিনা?' জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক যেভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হলো এ্যাসেম্বি এবং জাতীয় সঙ্গীত শব্দ দুটি তিনি জীবনে প্রথম শুনলেন। একজন সহকারি শিক্ষক তোতলাতে তোতলাতে জবাব দিলেন, 'এই চরের দেশে তো গানটানের চর্চা তেমন নাই...

তোফা চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা জাতীয় পতাকা তোলো? নাকি সেটাও বন্ধ?' সেই শিক্ষক আলমারির তাক থেকে খুঁজে পেতে ধুলি মলিন বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা কাপড়ের টুকরা বের করে আনলেন। ক্লাস ফোরে ঢুকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আমাদের দেশে অনেক দিন আগে একটা যুদ্ধ হয়েছিল, যাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি। সেই যুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা কি কেউ জানো?' আমি এক এক করে কুড়ি পঁচিশজন ছাত্র ছাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেবলই অন্ধকার দেখি। পঞ্চম শ্রেণিতে পাঁচজন শিক্ষার্থীকে শহীদ বজলুর রশীদ স্মৃতি বৃত্তি দেয়া হয়। আমার ধারণা ছিল, তারা অন্তত তাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে। উপস্থিত চারজনের মধ্যে কেবল একজন বলেছিল, 'বজলুর রশীদ এই স্কুল ঘর আমাদের জন্য বানায়া দিছেন।' শেষ পর্যন্ত ক্লাস ফাইভের ক্লাস শিক্ষিকাকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বলবো ভেবেছিলাম। আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত শিক্ষিকার মুখে কী অভিব্যক্তি ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর দৃশ্যমান দুই চোখে যে বিরক্তি আর অবজ্ঞার আভাস দেখেছি, তাতে আর কথা বলার কোনো আগ্রহ আমার ছিল না।

ফেরার পথে তোফা চাচা একবার শুধু বলেছিলেন, 'বয়স হয়ে গেছে। আজকাল আমি নিজে তো আর দেখা-শোনা করতে পারি না।' চাচার কথাটা নিস্ফল কৈফিয়তের মতো শোনায়। একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'কিছুদিন আগে তো চর নারায়ণপুর গ্রামের নাম পরিবর্তনেরও প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।' আমি তাঁর কথার উত্তরে একটি কথাই বলেছিলাম, 'যে দেশ আপনারা যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিলেন, তা আপনাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে চাচা।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, কাল সকালেই ঢাকা ফিরে যাবো এবং আর কখনোই শুধু চর নারায়ণপুরে নয়, দেশেই আসবো না। ভাবনাটা চূড়ান্ত করে ফেলার পরে নিজেকে বেশ হালকা লাগতে থাকে।

সূর্যাস্তের কিছু আগে হাঁটতে হাঁটতে আমি নদীর কাছাকাছি চলে যাই। ভাঙতে ভাঙতে একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে নদী। খাড়া পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে জলের কাছাকাছি। তোফা চাচার অযত্নের বাগান থেকে তুলে আনা দুহাত ভরা রক্তকরবি নিয়ে পাড় বেয়ে আমি জলের কিনারে এসে বসে পড়ি। সূর্য যখন ডুবতে বসেছে, ঠিক সেই সময় হাতের ফুলগুলো ভাসিয়ে দিই নদীর স্রোতে।■

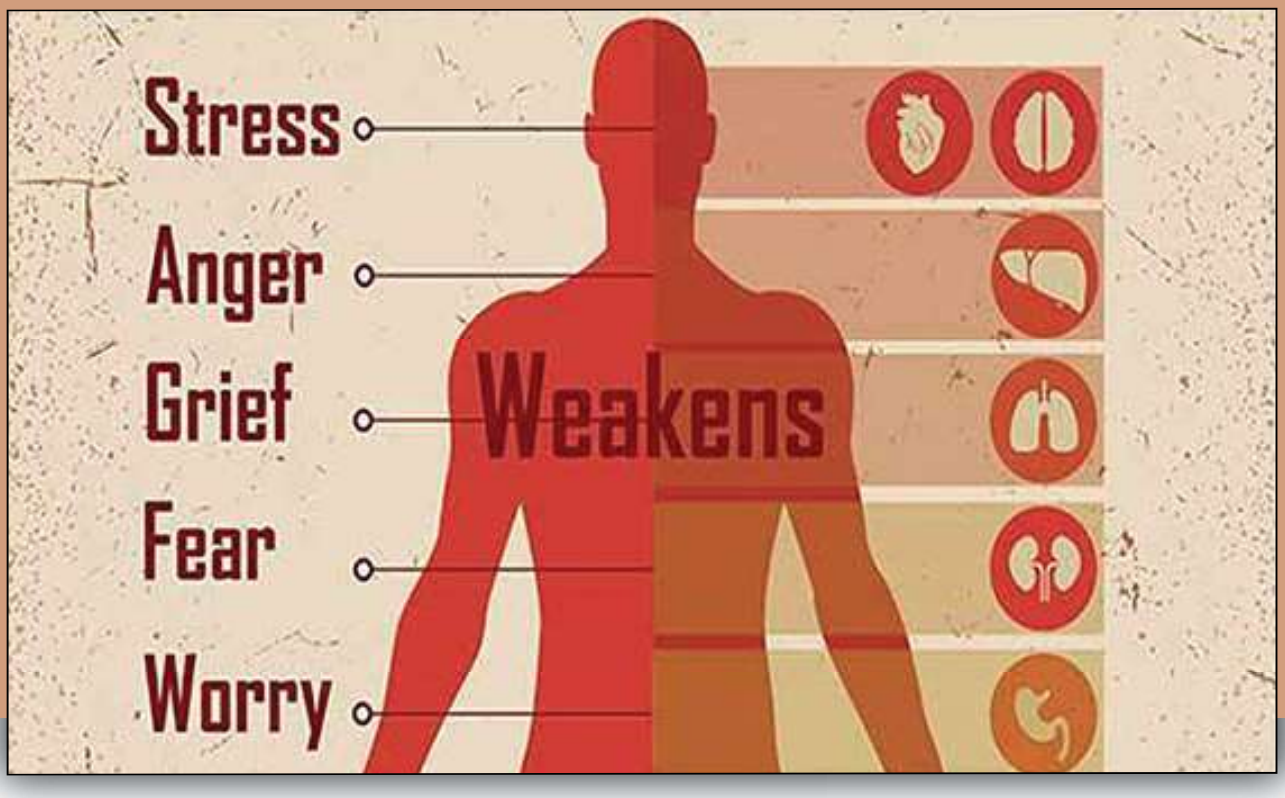

নেতিবাচক আবেগের শরীরবৃত্তীয় প্রভাব

ড. ফাররাহ অগাস্টিন বাঞ্চ
অনুবাদ: বিদ্যুত খোশনবীশ

ভয়, ক্রোধ, চাপ, ঈর্ষা, সন্দেহ ও ঘৃণার মত নেতিবাচক আবেগগুলো বহুলাংশে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। অপছন্দের বিয়ে, চাকরিচ্যুতি, প্রিয়জনের মৃত্যু কিংবা আর্থিক সংকট আবেগ ও মানসিক স্থিতিকে চরমভাবে বিনষ্ট করতে পারে যার মূল্য দিতে হয় আমাদের শরীরটিকেই।

আবেগ এক মহানিয়ন্ত্রক শক্তি। আবেগের প্রভাব শুধু আমাদের মনের উপর নয় বরং আমাদের ব্যক্তি সত্তা, যোগাযোগ দক্ষতা, যাপিত জীবন এবং এমনকি শুনলে অবাক হবেন, আমাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার উপরও এর দুর্দান্ত প্রভাব রয়েছে। তাই সুস্বাস্থ্য নিয়ে টিকে থাকার প্রয়োজনেই নিজের আবেগের সাথে, বিশেষ করে নেতিবাচক অনুভূতির সাথে এক রকম ভারসাম্যপূর্ণ বোঝাপড়া থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আবেগ মূলত প্রকাশমুখী, তাই নিজের মধ্যে পুষে রাখা আবেগ-অনুভূতিগুলো একটা সময় প্রচন্ড শক্তি নিয়ে প্রলয় ঘটাবেই। ফলে মন থেকে আবেগের নিয়মিত নিঃসরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যস্ততার এই যুগে সুষম আবেগীয় স্বাস্থ্য খুবই বিরল এক সম্পদ। কারণ একটিই– ভয়, ক্রোধ, চাপ, ঈর্ষা, সন্দেহ ও ঘৃণার মত নেতিবাচক আবেগগুলো বহুলাংশে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। অপছন্দের বিয়ে, চাকরিচ্যুতি, প্রিয়জনের মৃত্যু কিংবা আর্থিক সংকট আবেগ ও মানসিক স্থিতিকে চরমভাবে বিনষ্ট করতে পারে যার মূল্য দিতে হয় আমাদের শরীরটিকেই। তাই আসুন জেনে নেই নেতিবাচক আবেগ কিভাবে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

রাগ

রাগ বা ক্রোধকে সংজ্ঞায়িত করা হয় আঘাত, হতাশা ও হুমকির প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট এক তীব্র অনুভূতি হিসেবে। রাগকে দ্রুত প্রশমিত করা কিংবা গ্রহণযোগ্য উপায় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাগ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। এমনকি এই রাগ হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শরীরতত্ত্বে 'লড়াই করো, নয়তো পালিয়ে বাঁচো' (fight-or-flight) বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। রাগ আমাদের শরীরের এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উদ্দিপ্ত করে যার প্রভাবে চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ ঘটে। এই হরমোনের আকস্মিক অতিরিক্ত উপস্থিতি আমাদের মস্তিষ্কের আবেগ সৃষ্টিকারী অংশকে অত্যধিক প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য করে এবং এর ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের যুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী অংশে অস্বাভাবিক মাত্রায় রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। মস্তিষ্কের এই অংশে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহের কারণে আমাদের যুক্তিশীলতা বা বিচারবুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য হলেও লোপ পায়। হয়তো এ কারণেই লোকমুখে 'ক্রোধান্ধ' বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে। মস্তিষ্কের যুক্তিশীলতা লোপ পাওয়ার কারণেই

আমারা প্রায়শই হাতে থাকা দামী ল্যাপটপ, মোবাইল সেট কিংবা আরো অনেক কিছু ছুড়ে ফেলে দেই এবং কী করেছি তা বুঝতে পারি মাথা ঠান্ডা হবার পর। পাশাপাশি, রাগের কারণে মস্তিষ্কে প্রবাহিত অতিরিক্ত রক্ত আমাদের শিরা ও ধমনীকে টানটান করে রাখে এবং এতে হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। আর এরকম ঘটনা বার বার ঘটতে থাকলে একদিকে যেমন আমাদের মস্তিষ্কের ভালো-মন্দ বিচার করার সক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে তেমনি ধমনীতেও সৃষ্টি হয় ক্ষতিকর ক্ষত।

বুঝতেই পারছেন, রাগ আমাদের শরীরের কতটা ক্ষতি করে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের দু'টো কাজ করা দরকার। প্রথমত, নিয়মিত শরীর চর্চা করা এবং দ্বিতীয়ত রাগ প্রশমনের গ্রহণযোগ্য উপায় অবলম্বন করা।

দুঃখবোধ

দুঃখবোধ মানুষের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আবেগ। এই আবেগ আমাদের ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়, ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে অ্যাসমাসহ শ্বাসতন্ত্রের নানান রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখবোধ থেকে সৃষ্ট হতাশা আমাদের ত্বককে রুক্ষ করে তোলে, কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি ও রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এ ধরনের আবেগের কারণে যে কেউ তার শরীরের ওজন হারাতে কিংবা মুটিয়েও যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, হতাশাগ্রস্ত মানুষ মাদকসহ বিভিন্ন জীবননাশকারী নেশায় আক্রান্ত হয়।

তাহলে কী করবেন? দুঃবোধ জেগে উঠলে চোখের জল বিসর্জন দিতে দ্বিধা করবেন না। অশ্রু আপনার আবেগকে প্রশমিত করবে।

ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা

ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ও হতাশা সরাসরি আমাদের মস্তিষ্ক, যকৃত ও গলব্লাডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই তিনটি আবেগ অন্য সবকিছু থেকে আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। এ ধরনের আবেগ আমাদের চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেয় যার ফলে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই আমরা লক্ষ্য করি না। ঈর্ষা থেকেই অবসাদ, মানসিক চাপ ও অস্থিরতার জন্ম হয় যার সবগুলোই আমাদের রক্তে ক্ষতিকারক অ্যাড্রিনালিন ও নরাড্রিনালিন হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ ঘটায়। পাশাপাশি, এই আবেগগুলো আমাদের শরীরের বিষক্রিয়া প্রশমন প্রক্রিয়াকেও বাধাগ্রস্ত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে, হৃদস্পন্দন ও কোলেস্টেরল বৃদ্ধি এবং উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে। অনিদ্রা ও বদহজমের কারণও এই ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা।

মানসিক চাপ

অল্পবিস্তর মানসিক চাপ স্বাস্থ্যের জন্য মন্দ নয়। এটি আমাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু মানসিক চাপ সীমা ছাড়িয়ে গেলেই অ্যাজমা, আলসার, উচ্চ রক্তচাপসহ পেটের পীড়া ও গ্যাস্ট্রিকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত মানসিক চাপ যেহেতু কোলেস্টেরল বৃদ্ধি ও উচ্চ রক্তচাপের কারণ তাই এটি আমাদের হৃদরোগেরও অনুঘটক। এই আবেগ ধূমপান, অতিভোজনসহ নানা ধরনের বদ অভ্যাসের জন্ম দেয়। এখানেই শেষ নয়, মানসিক চাপ থেকে আরো যে রোগ হয় তা জানলে আপনি আতকে উঠবেন। মুখের ঘাঁ ও শুষ্কতা, মাথা ব্যাথা, অনিদ্রা, আচরণ বিকৃতি, অতিরিক্ত চুল পরা এমনকি টাক পরা, ঘাড় ও কাধে ব্যাথা এবং মেরুদন্ডে ব্যাথার উৎসও এই মানসিক চাপ। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাথা এবং তন্দ্রার জন্ম দেয়। পাকস্থলীর বিভিন্ন রোগ এবং আলসারের একটি বড় কারণ এই উদ্বেগ।

ভয়

ভয় আমাদের সুখ, আত্মবিশ্বাস, নৈতিক সাহস ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। ভয় থেকে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ক্ষেত্র বিশেষে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং হাত-পা শক্ত হয়ে যায়। মুত্রনালীর বিভিন্ন রোগের কারণ এই ভয়। ভয় থেকে সৃষ্টি হতে পারে পীঠের ব্যাথাও।

দুঃশ্চিন্তা

দুঃশ্চিন্তা আমাদের প্লীহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পাকস্থলীকে দুর্বল করে দেয়। খুব বেশি মাত্রায় দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলে ডায়রিয়া, বদহজম কিংবা

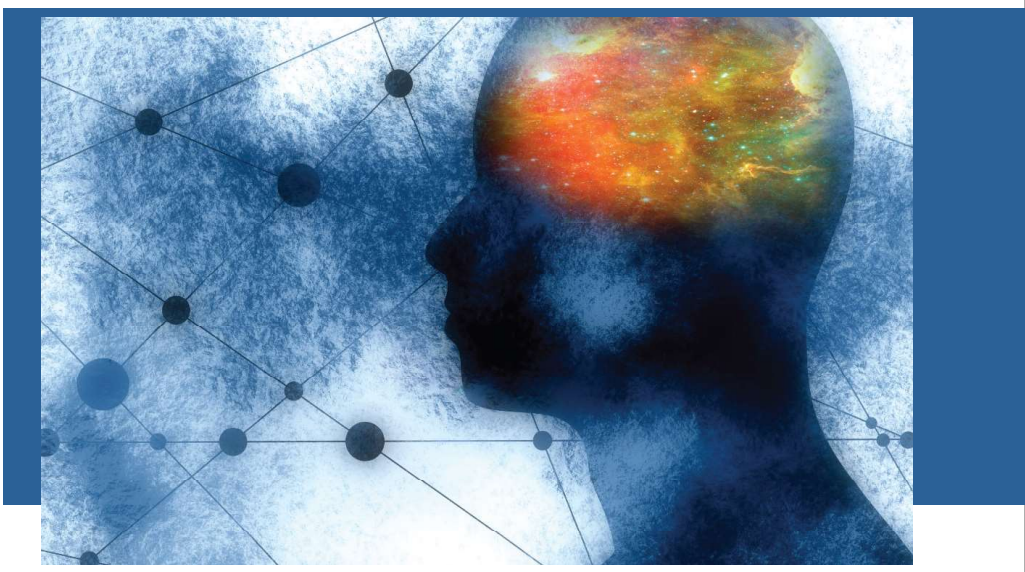

নিঃসঙ্গতা/একাকিত্ব

একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। তবে একাকিত্ব যদি কাউকে পেয়ে বসে তবে সেটা দুঃসংবাদ। একাকিত্ববোধ মানুষকে এক গভীর বিষাদে নিক্ষেপ করে। এই আবেগের ফলে অনেকে প্রায়শই কান্নাকাটি করেন। এতে আমাদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পুরো শরীরে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। একাকিত্ব অনিদ্রার জন্ম দেয়, উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

উদ্বেগ

উদ্বেগের কিছু ভালো প্রভাব আছে। উদ্বেগ মস্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট স্থানে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। এর একটা ইতিবাচক প্রভাব আমাদের দেহে পড়ে। কিন্তু উদ্বেগ যদি আমাদের নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয় তবে সেটা মোটেই ভালো কিছু নয়। নিয়মিত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া মাথা ব্যাথা, বমিও হতে পারে। একই সাথে উচ্চ রক্তচাপ, বুকে ব্যাথা, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার সাথে দুঃশ্চিন্তার গভীর সম্পর্ক আছে। দুঃশ্চিন্তা খুব সহজেই আপনার ঘুম কেড়ে নেয়, ফলে ঘুমের অভাবে যত ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তার সবই আমাদের ঘিরে ধরতে পারে।

আবেগকে আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কারণ আবেগ মানব জীবনের অনিবার্য অংশ। আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো দোষের কিছু নয়, তবে সেটা হতে হবে গ্রহণযোগ্য উপায়ে। আর নেতিবাচক আবেগকে প্রশমিত করাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং চেষ্টা করুণ নেতিবাচক আবেগ যাতে আপনাকে তাড়িত করতে না পারে। কারণ এর সাথে শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্যই নয়, জড়িয়ে আছে আমাদের শারীরিক সুস্থ্যতাও।■

● সূত্রঃ www.drfarrahmd.com

বিশুদ্ধ পানি, সুস্থ জীবন
একটি সাশ্রয়ী আয়রণ দূরীকরণ ফিল্টার

মো. সানাউল্লাহ

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে এবং এই আয়রন থেকে রক্ষা পেতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ধরনের অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কিন্তু আমরা চাইলেই খুব কম খরচে অথচ কার্যকরী আয়রন দূরীকরণ ফিল্টার বাড়িতেই তৈরি করতে পারি। যেখানে আয়রনের মাত্রা খুব বেশি অর্থাৎ পানি পাত্রে রাখার ১০-২০ মিনিটের মধ্যে আয়রনের আস্তরণ পড়ে, জামা কাপড় লাল হয়ে যায় সে-সব এলাকার জন্য এই ফিল্টার বেশি উপযোগী। কারণ এই ফিল্টারের পানি পরিশোধনের ক্ষমতা অনেক বেশি এবং সহজে পরিষ্কারযোগ্য, যা বাজারের গতানুগতিক ফিল্টারের পক্ষে সম্ভব নয়। আসুন জেনে নেই এ ধরনের একটি ফিল্টার আপনি কিভাবে তৈরি করতে পারেন।

প্রথমে ২০ থেকে ৫০ লিটার বা একটি পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী বালতি বা ড্রাম নিন। তাছাড়া বাজারে বিবকক/কল লাগানো ড্রামও কিনতে পাওয়া যায়। ড্রামের সাইজমত যেখানে ড্রাম/বালতিটি সঠিকভাবে বসে, সে অনুসারে ৪ খুঁটিযুক্ত টুল ঘরের সুবিধামত জায়গায় বসিয়ে নিন। তবে ড্রাম/বালতির সাইজ অনুসারে টুলের মাপ এবং খুঁটি মজবুত হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। বালতির উচ্চতা এবং চওড়া অনুযায়ী ফিল্টারিং উপাদানের ঘনত্ব যাচাই করতে হবে। একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, পানির পরিমাণ বাড়ালে ফিল্টারিং উপকরণের পরিমাণও আনুপাতিক হারে বাড়বে। প্রতি ২৫ লিটার পানি পাওয়ার জন্য ১/২ সি.এফ.টি করে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, সে অনুসারে ৫০ লিটার পানি হলে উপকরণের পরিমাণ হবে তার দ্বিগুন।

আসুন এখন জেনে নেই কিভাবে ফিল্টার প্রস্তুত প্রক্রিয়া শুরু করবেন। প্রথমে ফিল্টারিং উপকরণগুলো বাজার থেকে সংগ্রহ করে ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে সারাদিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর পর চিত্রে দেখানো ধাপ অনুযায়ী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বালতি/ড্রাম পূর্ণ করতে হবে। এরপর যেসব পানিতে আয়রনের মাত্রা ৩.৫০ থেকে ৬ মি. গ্রামের মধ্যে রয়েছে সে পানিকে পুরো ফিল্টার মিডিয়ার উপর ঢেলে দিতে হবে। ২০-৩০ মিনিট পর পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি পাওয়া যাবে। আর যদি রাতে পানি দিয়ে পূর্ণ করেন তবে সকাল থেকেই আয়রনমুক্ত পানি পাবেন।

এভাবে প্রক্রিয়াটি নিয়মিত চলতে থাকবে, ফিল্টারিং উপকরণগুলো পরিষ্কার করার বিষয়টি নির্ভর করবে কি পরিমাণ আয়রন জমা হচ্ছে তার উপর। পরিষ্কার করার নিয়ম হচ্ছে একটি পরিষ্কার পাত্রে পানি দিয়ে কিছু লবণ মিশিয়ে ফিল্টারিং উপকরণগুলো ঐ পানিতে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর পুনরায় রোদে শুকিয়ে পূর্বের মত ক্রমানুসারে বিছিয়ে দিতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে, বালির স্তর মিশে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। কারো নিজের ইলেকট্রিক মটর থাকলে পি.ভি.সি পাইপ কলের মুখে লাগিয়ে ২ মিনিট ব্যাক্ওয়াশ দিয়ে পানি ফেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলেও চলবে। যেসব নলকূপের গভীরতা খুব কম সেগুলোর পানি ব্যবহার না করাই ভালো, তবে এ গভীরতা ৫০/৬০ ফুটের বেশি হলে ভালো হয়। পানিতে ব্যাকটেরিয়া/ জীবাণু আছে সন্দেহ হলে ম্যাঙ্গানিজ দানা কিনে উপর থেকে সর্বপ্রথম স্তর কাঠকয়লার সাথে ছেড়ে দিলে তা জীবাণু ধ্বংস করবে। কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মানবসেবা করার জন্য এগিয়ে আসলে অথবা বানিজ্যিকভাবে বাজারজাত করতে চাইলে গঠনগত প্রক্রিয়া আরো উন্নত আদলে পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।

সুবিধা

- বাজার থেকে কেনা ফিল্টারের তুলনায় নির্মাণ খরচ কম।
- পানি ডিসচার্জের পরিমাণ অন্য ফিল্টারের তুলনায় বেশি।
- পরিষ্কার করা সহজ। কোনো নাট-বোল্ট খোলার ঝামেলা নেই।
- বাজারের ফিল্টারের তুলনায় ফিল্টারিং উপকরণ বেশি থাকায় বেশি স্বচ্ছ পানি পাওয়া যায়।
- ব্যবহৃত উপাদানগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং অধিক রাফ সারফেস হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র জীবাণু ও আয়রণ শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি।

সতর্কতা

- বিবকক/কল সঠিকভাবে না লাগালে (গ্যাসকেটিং করা) পানি চুঁয়াতে পারে।
- দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করলে শ্যাওলা পড়তে পারে।

উপযোগিতা

বুরো বাংলাদেশের ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলের নমুনাভিত্তিক অগভীর নলকূপের পানি পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৬০% পানি মাত্রাতিরিক্ত আয়রণযুক্ত। এ মাত্রা টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, ঝালকাঠি, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চলে প্রায় ৮৫-৯০%। নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে যে পানির আয়রণ থেকে রক্ষা পেতে মানুষ বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে যা স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। ফলে এসব অঞ্চলের মানুষ অতি সহজে ও কম খরচে এ ধরনের ফিল্টার তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন।

সহজ ও সাশ্রয়ী আয়রণ দূরীকরণ ফিল্টার

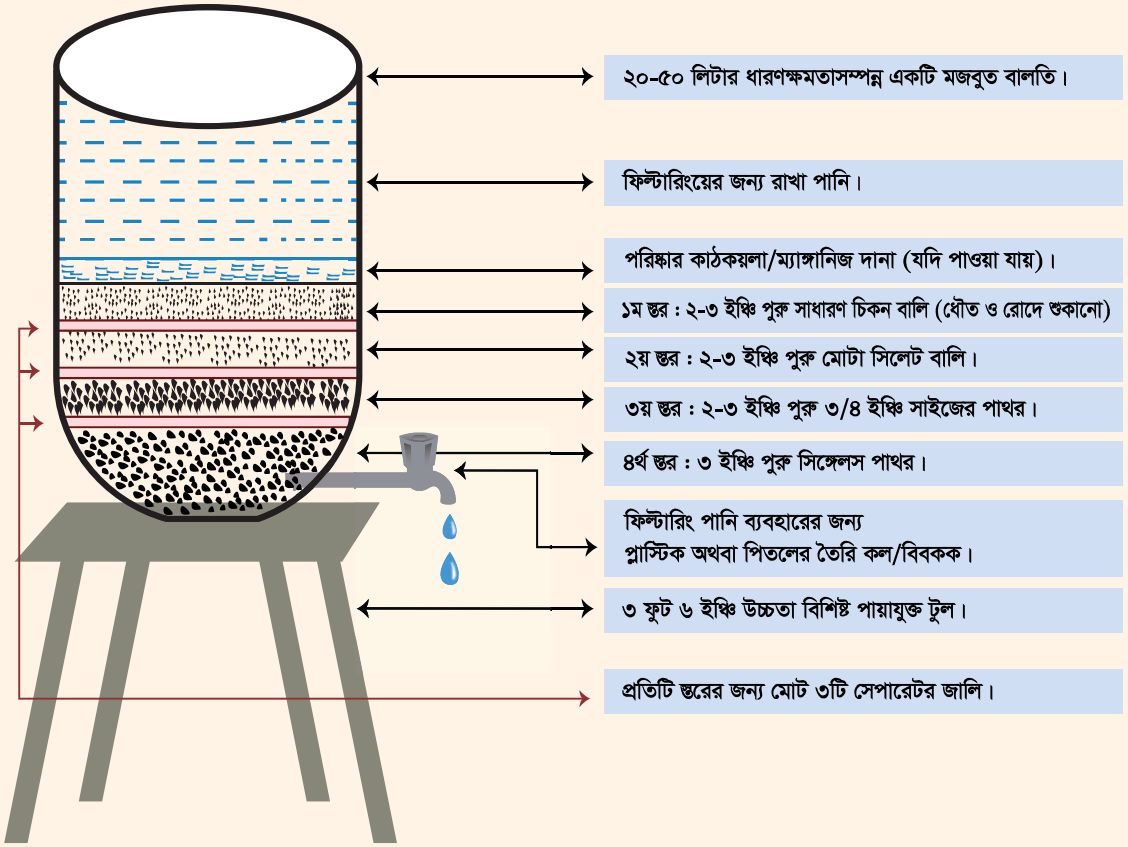

তৈরির উপাদানসমূহ : ১টি টুল, ১টি বালতি, নির্দিষ্ট সাইজের ৩টি জালি, ১টি বিবকক, ১/২ ঘনফুট সিঙ্গেলস পাথর (গোলাকৃতি), ১/২ ঘনফুট ৩/৪ ইঞ্চি সাদা পাথর, পরিমাণমত মোটা বালি (সিলেট বালি), চিকন বালি, কাঠকয়লা, ম্যাঙ্গানিজ দানা (যদি পাওয়া যায়)।

২০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফিল্টার তৈরীর বাজেট

উপাদানের বর্ণনা	একক	দর	পরিমাণ/সংখ্যা	মোট টাকা
বিবকক লাগানো ড্রাম	১টি	৩০০	০১	৩০০
১/২ ঘনফুট ৩/৪ ইঞ্চি পাথরকণা	ঘনফুট	১৬০	.৫০	৮০
১/২ ঘনফুট বোল্ডার	ঘনফুট	১০০	.৫০	৫০
মোটা বালি	ঘনফুট	৬০	.৫০	৩০
চিকন বালি	ঘনফুট	৩০	.৫০	১৫
কাঠকয়লা	ঘনফুট	৮০	.৫০	৪০
সেপারেটর জালি	পিস	৪০	৩	১২০
			মোট বাজেট	৬৩৫

● লেখক : উর্ধ্বতন প্রকল্প প্রকৌশলী। ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগ্রাম, বুরো বাংলাদেশ

অফিস টেবিলের নান্দনিকতা

উম্মে হাবিবা

জানেন নিশ্চই, "একটি অগোছালো ডেস্ক, একটি অগোছালো মনের পরিচায়ক।" অফিসের টেবিলের উপর একগাদা কাগজপত্র বা ফাইল পড়ে থাকা মানে এই নয় যে আপনি অনেক কাজ করছেন, বরং এটি আপনার অগোছালো স্বভাবের কথাই অন্যকে বুঝিয়ে দেয়। পরিচ্ছন্ন কর্মস্থল আপনার কর্মস্পৃহা এবং মনোযোগকে যে কতগুণে বাড়িয়ে দিবে তা হয়তো আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না।

কাজ করতে করতে নানা ধরনের কাগজপত্র জমে অফিসের টেবিল অগোছালো হয়ে পড়ে। তাই নিয়ম করে প্রতিদিন টেবিল গুছিয়ে রাখা উচিত। তবে অনেকসময় আমরা হয়তোবা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না যে কিভাবে ডেস্কটি পরিপাটি রাখতে পারি।

আসুন আমার কয়েকটি আইডিয়া শেয়ার করি:

১. প্রথমে আপনার ডেস্ক বা টেবিলটি সম্পূর্ন খালি করে ফেলতে পারেন। এটা আপনার টেবিলটিকে পুনরায় গুছাতে সহায়তা করবে। ড্রয়ারে যদি কিছু থাকে তাও খালি করে ফেলুন।

২. টেবিলটি পরিষ্কার করে ফেলুন। টেবিল মুছার জন্য পরিষ্কার একটুকরো কাপড় ব্যবহার করুন।

৩. এবার কম্পিউটারের মনিটরটি আপনার চোখের আরাম অনুযায়ী অর্থাৎ শ্রান্তি দূরত্বে বসিয়ে নিন। ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে হিসেবে অফিস পরিবেশের সাথে মানানসই ওয়াল পেপার সেট করুন। নিজের, পরিবারের কিংবা সন্তানের ছবি এক্ষেত্রে না ব্যবহার করাই শ্রেয়।

৪. টেবিলে সুন্দর একটি দিনপঞ্জি রাখতে পারেন, পাশে একটি নান্দনিক ফটোফ্রেমও থাকতে পারে যেটাতে আপনার প্রিয় একটি ছবি শোভা পাবে। ছবিটি হতে পারে আপনার প্রিয় সন্তানের। তবে ফ্রেমে অতিমাত্রায় পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোন ছবি না রাখাই শোভনীয়।

৫. টেবিল সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে টেবিলের পাশে ছোট গাছ রাখতে পারেন। গাছের দিকে চোখ গেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবে আপনার মনটাও। টেবিলে শোভাবর্ধন করার জন্যই বিভিন্ন আকর্ষণীয় গাছ এখন বাজারে পাওয়া যায়।

৬. স্টেপলার, জেমস ক্লিপ, রাবার স্ট্যাম্পসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি দ্রব্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখুন। একটি ছোট ট্রেও ব্যবহার করতে পারেন। কলম, পেনসিল, ইরেজার, মার্কার রাখতে কলমদানী ব্যবহার করতে পারেন।

৭. দুটি কার্ড হোল্ডার রাখতে পারেন। একটির মধ্যে নিজের কার্ড আর অন্যটির মধ্যে কাজের প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন ব্যক্তিদের কার্ড সংরক্ষণ করাই ভালো।

৮. কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ নিয়মিত পরিষ্কার করুন। টেবিলের উপর বেশি কাগজপত্র জমতে দিবেন না, কাজ শেষ হলে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেলে দিন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাক বা শেলফে গুছিয়ে রাখুন। টেবিলের পাশে একটা বিন রাখুন।

৯. টেবিলে একটি টিস্যু বক্স রাখতে পারেন। চা-কফি খাওয়ার পর খুব বেশিক্ষণ যাতে সেই কাপ টেবিলে না থাকে সেদিকে নজর রাখুন।

১০. ছোট নোটবুক এবং কলম রাখুন হাতের কাছেই যাতে প্রয়োজনে নোট নিতে পারেন।

১১. আর আপনার সেল ফোনটি রাখার জন্য একটি সুন্দর হোল্ডার ডেস্কে শোভা পেতেই পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে কোনো কর্মীর ডেস্ক যদি গোছানো থাকে তখন তিনি অনেকখানি বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারেন। এতে তার কর্মদক্ষতা দুই-তিনগুণ বেড়ে যায়। আর যারা অগোছালো ডেস্কে কাজ করেন, তাদের অধিকাংশ সময়ই কেটে যায় দরকারী জিনিসপত্র খুঁজতে বের করতে। এভাবে কাজ করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, একসময় কাজের প্রতি আগ্রহও হারিয়ে ফেলেন।

অতএব আপনার ডেস্কটি পরিপাটি রাখুন। আপনারই ভালো লাগবে, কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি যখন বাইরে থেকে কেউ ভিজিটে আসবেন, তিনি আপনার ও আপনার অফিস সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণা নিয়ে যাবেন। এটাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!■

● লেখক: প্রশিক্ষক, মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বারিধারা, ঢাকা

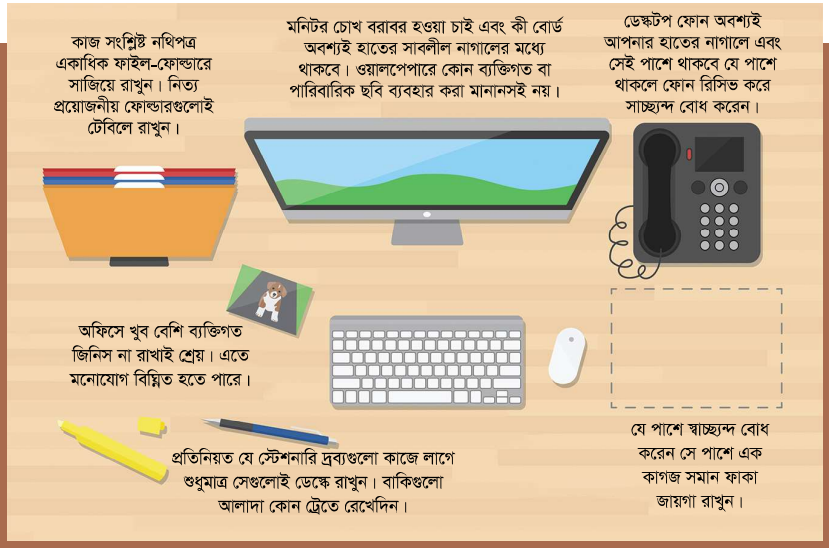

আকতার হোসেন এর দিন বদল

আবুল বাশার

অভাবের কারণে খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন চলছিল কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের মোহাম্মদ আকতার হোসেনের। একটা সময় তিনি দুই চোখে শুধু অন্ধকার দেখছিলেন। এমন অবস্থায় বেকার জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে ২০০৩ সালে চাকুরী নিলেন চট্টগ্রাম ওয়ালম্যাট সুপারসপে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেন সেখানে। এরপর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজে ছোট একটা ব্যবসা শুরু করেন। দোকানের নাম দেন সামির ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর এন্ড ফুড। কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে পুজির অভাবে কয়েক বছর সফলতার মুখ তিনি দেখছিলেন না। ঠিক সেই সময় পরিচয় হয় বুরো বাংলাদেশের এক কর্মীর সাথে।

এরপর ২০১২ সালে বুরো বাংলাদেশ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নেন। ঠিকমত ঋণের টাকা পরিশোধ করায় পরের বছর আবার ঋণ পান। এরপর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আস্তে আস্তে তার ব্যবসা বড় হতে থাকে। এভাবে ৯ বছরে তিনি বুরো বাংলাদেশ হতে ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিয়মিত পরিশোধ করে আসছেন।

বর্তমানে মোহাম্মদ আকতার হোসেন এর দুইটি দোকান থেকে দৈনিক আয় প্রায় এক লক্ষ টাকা। এই দোকানে কাজ করেন ১০ জন কর্মচারী। ব্যবসা ভাল হওয়ায় তিনি আরেকটি দোকান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ক্রেতার সাথে ভালো ব্যবহার ও সততার কারণে তার দোকানে সব সময় ভিড় লেগে থাকে যা একটা দৃষ্টান্ত। তিনি তার দোকানে মানসম্মত পণ্য বিক্রি করেন যে কারণে দিনের বেশির ভাগ সময়েই ক্রেতাদের ভিড় থাকতে দেখা যায়। যেহেতু ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর তাই বিভিন্ন ধরনের মালামাল তার দোকানে পাওয়া যায়।

পরিশ্রম করলে যে সফলতা আসে তার জ্বলন্ত প্রমাণ মোহাম্মদ আকতার হোসেন। তিনি এখনও দৈনিক ১৮ ঘন্টা কাজ করেন।

মোহাম্মদ আকতার হোসেন অনেক সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। তার ৩ ছেলে। বড় ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ও মেঝ ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে। ছোট ছেলের বয়স ৪ বছর। তিনি ছোট বেলায় দারিদ্র্যের কারণে পড়ালেখা করতে পারেননি তাই সন্তানদের উচ্চ শিক্ষিত করতে চান।

তার ইচ্ছে ব্যবসাকে আরো বড় করে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং জনসেবা মূলক কাজ করা। তিনি ইতোমধ্যে একটি মসজিদ নির্মাণে ৮০ হাজার টাকা দান করেছেন। পাশাপাশি অনেক সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। একটা সময় মোহাম্মদ আকতার হোসেন অন্যের দোকানে চাকুরী করতেন এখন তার দোকানেই ১০ জন বেকারের কর্মসংস্থান করেছেন এবং আরো বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সমাজে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চান। আমরা তার সফলতা কামনা করি।■

● লেখক : সহকারী কর্মকর্তা- প্রশিক্ষণ
বুরো বাংলাদেশ
মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

মো. সফিকুল হক চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট, আশা

জন্ম: ১৯৪৯ ॥ মৃত্যু: ২০২১

জাকির হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ
চেয়ার, এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি)

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মো. সফিকুল হক চৌধুরী গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

সফিকুল হক চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন ইস্যুতে তার সাথে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী ও বহুমাত্রিক মানবিক গুণের অধিকারী। সেক্টরের প্রয়োজনে তিনি বরাবরই পাশে দাঁড়িয়েছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ছিলেন এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি) এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং একজন সম্মানিত উপদেষ্টা। তার মৃত্যুতে এই সেক্টর একজন সুযোগ্য নেতাকে হারালো।

সফিকুল হক চৌধুরী'র জন্ম ১৯৪৯ সালে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬৯ সালে। ১৯৭৩ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও সরকারি চাকরিতে যোগ না দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে ১৯৭৮ সালে মানিকগঞ্জের টেপরা গ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট' (আশা), যা আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভরশীল এনজিও হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন স্বল্প খরচে ক্ষুদ্রঋণ ধারণার পথিকৃৎ। তার নেতৃত্বে গত চার দশক ধরে আশা পুরো দেশ এবং ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, ফিলিপিন্স, কম্বোডিয়া, কেনিয়া ও নাইজেরিয়াসহ বিশ্বের ১৩টি দেশে ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। তার অনবদ্য নেতৃত্বগুণ ও দূরদৃষ্টির কারণে ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা হিসেবে কৃষি, যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন।

সফিকুল হক চৌধুরী'র মৃত্যুতে জাতি যেমন তার এক মেধাবী সন্তানকে হারিয়েছে, তেমনি বেসরকারি উন্নয়ন সেক্টর হারিয়েছে এক সুযোগ্য নেতাকে। দুঃখজনক হলেও সত্য এই শূন্যতা কখনো পূরণ হবার নয়।

আমি সফিকুল হক চৌধুরী'র বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সাথে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আশা'র সর্বস্তরের কর্মীদের প্রতি।■

বুরো বাংলাদেশের ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে এমআরএ'র ইভিসি মো. ফসিউল্লাহ

গত ১৬ মার্চ ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলায় বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ এবং কৃষি ও এসএমই খাতে সংস্থার গ্রাহকদের মাঝে এই ঋণ বিতরণ করা হয়। জনাব মো. ফসিউল্লাহ তার বক্তব্যে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য বুরো বাংলাদেশের ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রশংসা করেন এবং দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সহায়ক অংশীদার হিসেবে বুরো বাংলাদেশ ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৫০ জন ঋণ গ্রহীতার অনেকের সাথে কথা বলেন এবং তাদের হাতে ঋণের অর্থ তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গফরগাঁও এর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. তাজুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব জাকির হোসেন বিগত তিন দশকের মতো আগামী দিনগুলোতেও দেশের দারিদ্র্য বিমোচন তথা দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সভাপতি জনাব জাকির হোসেন প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ বণিক ও অতিরিক্ত পরিচালক অপারেশনস ফারমিনা হোসেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র

অর্থায়ন খাতের প্রণোদনার জন্য ইতোমধ্যে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং আরো ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

এর আগে ১৫ মার্চ সকালে জনাব মো. ফসিউল্লাহ বুরো বাংলাদেশের সখীপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কার্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং মধুপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে যাওয়ার পথে আউশনারা শাখায় যাত্রা বিরতি করে বুরো বাংলাদেশের বিনামূল্যে করোনাভাইরাসের টিকা রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এমন উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি বুরো বাংলাদেশকে সাধুবাদ জানান। পরে জনাব মো. ফসিউল্লাহ মধুপুরে অবস্থিত বুরো ক্রাফট-এর ফ্যাক্টরিতে উপস্থিত হয়ে কাচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কলাগাছের বাকল থেকে উৎপন্ন প্রাকৃতিক আঁশ দিয়ে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন। প্রাকৃতিক বর্জ্য থেকে মূল্যবান আঁশ সংগ্রহ ও তা দিয়ে উৎপাদিত দৃষ্টিনন্দন নিত্য ব্যবহার্য পণ্য দেখে তিনি অভিভূত হন। তিনি এই শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করায় বুরো বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৫ মার্চ বিকেলে সংস্থার মধুপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের মিলনায়তনে এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় থেকে আগত বিভাগীয় প্রধানগণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এই সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মধুপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আরিফা জহুরা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মো. আব্দুল করিম। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। বক্তব্য রাখেন পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন ও পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ বণিক। মতবিনিময় সভার শুরুতেই বুরো বাংলাদেশ এর কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক অপারেশনস ফারমিনা হোসেন। মতবিনিময় সভা শেষে একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।■

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ কর বর্ষে বুরো বাংলাদেশ 'অন্যান্য' কাট্যাগরিতে (এনজিও/এমএফআই) ২য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়ে ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা পত্র-২০২০ এবং পদক গ্রহণ করেছে। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামালের পক্ষে কর অঞ্চল-৫ এর কর কমিশনার জনাব সোয়ায়েব আহমেদ সম্মাননাপত্র এবং পদক হস্তান্তর করেন বুরো বাংলাদেশ এর পরিচালক (অর্থ) জনাব মো. মোশাররফ হোসেন এর নিকট। এ সময় সংস্থার অর্থ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম এবং ঊর্ধ্বতন অফিস ব্যবস্থাপক বিদ্যুত খোশনবীশ উপস্থিত ছিলেন।

আরিফুল হক চৌধুরী আশা'র নতুন প্রেসিডেন্ট

মো. আরিফুল হক চৌধুরী আশার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ আশা পরিচালনা পর্ষদের ১২৯তম সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে মো. আরিফুল হক চৌধুরীকে আশার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ নিয়োগ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে কার্যকর হয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি আশা'র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআর)সহ সংস্থার নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মো. আরিফুল হক চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ (ম্যানেজমেন্ট) ও এমবিএ (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস) ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্রাথক্লাইড ইউনিভার্সিটি, স্কটল্যান্ড থেকে এমএসসি (ফিন্যান্স) ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

উল্লেখ্য, আশা'র প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট জনাব মো. সফিকুল হক চৌধুরী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মৃত্যুবরণ করায় আশার প্রেসিডেন্ট পদটি শূন্য হয়।

মুজিব বর্ষে ইপসা'র ভ্যান গাড়ি উপহার

স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা মুজিব বর্ষে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২৩ মার্চ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ২৮ জন হতদরিদ্র চালককে ভ্যান গাড়ি উপহার দিয়েছে । বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর সহযোগিতায় স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. এম. মফিজুর রহমান মিলনায়তন, ইপসা এইচআরডিসি ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব ভ্যান গাড়ি প্রদান করা হয়।

ইপসার পরিচালক (অর্থ) পলাশ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও রেডিও সাগরগিরি'র প্রযোজক সঞ্জয় চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিল্টন রায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইপসার পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন) মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাবের সভাপতি সৌমিত্র চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক লিটন কুমার চৌধুরী, সাংবাদিক শেখ সালাউদ্দিন, ইপসার এরিয়া ম্যানেজার দিদারুল ইসলাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদিয়া তাজিন ও ইপসার কর্মকর্তা মো. আনিসুল হক।

বুরো বাংলাদেশের বিনামূল্যে টিকা রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম। গত ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে চল্লিশোর্ধ্ব নাগরিকসহ সম্মুখ সারির করোনাযোদ্ধাদের টিকা দেয়ার প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিনামূল্যে দেয়া এই টিকা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে বুরো বাংলাদেশ এর ২৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করেছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলে অবস্থিত বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. সাঈদা খান এবং বুরো ক্রাফটের পরিচালক ও বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির সদস্য রাহেলা জাকির।

নুপুর খানম। থাকেন রাজধানীর বাড্ডায়। এখানেই তার ফ্যাক্টরি। প্রতিদিন তৈরি হয় শত শত ব্যাগ। গ্রোসারি ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, ফলের ব্যাগ এবং এমনকি ল্যাপটপ ব্যাগও। সবই পাটের। দেশের কর্পোরেট অর্ডারসহ বিদেশি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাগ তৈরি হয় তার এ কারখানায়। রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, হংকং ও ভারতসহ বিশ্বের বহুদেশে। ৩০ জন সুবিধাবঞ্চিত নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে তার উদ্যোগে। নুপুর খানমের উদ্যোক্তা হয়ে উঠা ২০১৩ থেকে। শুরু করেছিলেন একাই, পরে পাশে পেয়েছেন ভাইকে। আর বিগত পাঁচ বছর ধরে পাশে আছে বুরো বাংলাদেশও। তিনি বিশ্বাস করেন- বুরো'র মতো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করলে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সৃষ্টি হবে অসংখ্য নুপুর।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ • সংখ্যা-২৪ • বর্ষ-৬

BURO
Bangladesh

কৃষকের সেবায়
বুরো বাংলাদেশ

বুরো কৃষি সেবা
হট লাইন
০১৭০৯ ৯৮৪ ৬০৪

কৃষি বিষয়ক যে কোনো
পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন প্রতিদিন
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা